INSTITUTE OF EDUCATION FOR WO
Dept. of Extension
Services
CALCUTTA

জীবনবিজ্ঞান

অষ্টম শ্রেণীর জন্য

3383

ডঃ তারক মোহন দাস

This book was taken from the Library of
Extension Services Department on the date
last stamped. It is returnable within
3383 7 days.

জীবনবিজ্ঞান

INSTITUTE OF EDUCATION FOR WOMEN,
3383
Deptt of Extension
Services.
22. 3. 76
CALCUTTA-27

পঞ্চতীর্থ

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ প্রবর্তিত জীবনবিজ্ঞানের নূতন পাঠ্যসূচী
অনুযায়ী অষ্টম শ্রেণীর জন্য লিখিত।

জীবনবিজ্ঞান

(অষ্টম শ্রেণীর জন্য)

ডক্টর তারক মোহন দাস, এম. এস-সি., পি-এইচ. ডি. (লণ্ডন),
ডি. আই. সি.,
কনভেনার, লাইফ সায়েন্স সেণ্টার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ;
অধ্যাপক, কৃষি বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ;
যুগ্ম-সম্পাদক, 'ইণ্ডিয়ান বায়োলজিস্ট' ;
দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের নরসিং দাস পুরস্কারপ্রাপ্ত বিজ্ঞান গ্রন্থ
'আমার ঘরের আশেপাশে'র লেখক

INSTITUTE OF EDUCATION FOR WOMEN
3383
Deptt of Extension
Services.
22.3.76
CALCUTTA-27

M

দি ম্যাকমিলান কোম্পানি অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড
294, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-12
1975

THE MACMILLAN COMPANY OF INDIA LIMITED

DELHI MADRAS CALCUTTA BOMBAY

Associate companies throughout the world

Copyright © Mrs. Namita Das, 1975

First Edition 1975

"This book has been published on the paper supplied through the Government of India at concessional rate."

উৎসর্গ

শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক সৌরীন্দ্রমোহন সরকারের

করকমলে

Made in India

Printed by B. Mukherji at Kalika Press Private Ltd.

25, D. L. Roy Street, Calcutta-700006 and

Published by U. N. Banerjee, for The Macmillan Co. of India Ltd.

294, B. B. Ganguly Street, Calcutta-700012

ভূমিকা

জীবনবিজ্ঞানের মৌল বিষয়গুলির চর্চার উদ্দেশ্যে আমরা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 1968 খৃষ্টাব্দে "লাইফ সায়েন্স সেণ্টারের" প্রতিষ্ঠা করি। 1971 সনে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রাণ্টস্ কমিশনের তদানীন্তন চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডি. এস. কোঠারীর সক্রিয় সহানুভূতি ও আনুকূল্যে উৎসাহিত হয়ে আমরা শিক্ষার সকল স্তরে জীবনবিজ্ঞান চর্চার প্রসারে উদ্যোগী হই।

বর্তমান পরিবেশে পৃথিবীতে বাস করতে হ'লে জীবনবিজ্ঞান সম্পর্কে ন্যূনতম প্রয়োজনীয় জ্ঞান প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কাছেই অপরিহার্য, যেমন—সকল জীবের মূল প্রকৃতি, জীবনের সঙ্গে পরিবেশের সম্পর্ক, পরিবেশের সম্পদগুলি কিভাবে আমরা ব্যবহার করছি, পৃথিবীর জল, বায়ু, মাটি, জীবাণু, উদ্ভিদ ও পশুপক্ষীরা কিভাবে আমাদের জীবনধারণে সাহায্য করছে, পৃথিবীতে জীবন যাপনের বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি কি হওয়া উচিত, আমরা তা ঠিকমত পালন করছি কিনা ইত্যাদি। অত্যন্ত সুখের বিষয়, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সুযোগ্য নেতৃত্বে আজ জীবনবিজ্ঞান মাধ্যমিক শিক্ষাক্রমে এক বিশেষ মর্যাদার আসন লাভ করেছে। পর্ষদের দশম শ্রেণীর শিক্ষাক্রম অনুযায়ী অত্যন্ত মনোযোগ ও সতর্কতার সঙ্গে এই পুস্তকটি রচনা করা হয়েছে। বিজ্ঞান শিক্ষার যা শ্রেষ্ঠ পন্থা,—পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা, যুক্তি ও প্রমাণ সংগ্রহের মাধ্যমে অগ্রসর হওয়া—সেই সোজা পথে, সহজ ভাষায় বইটি লেখবার চেষ্টা করা হয়েছে। তরুণ শিক্ষার্থীদের কোন তথ্য মুখস্থ করবার প্রয়োজন যাতে না হয় সেই বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়েছে। শিক্ষার্থীর জীবন ও পরিবেশ সম্পর্কে প্রকৃত কৌতূহল, আগ্রহ ও মনোযোগ যাতে বৃদ্ধি পায়, সেই বিষয়েই প্রধানতঃ লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

এই পুস্তকরচনার অধিকাংশ কার্যের জন্য স্বীকৃতি জানাই আমার সহধর্মিণী শ্রীমতী নমিতা দাসকে।

ইতি—

1 ডিসেম্বর, 1975 **শ্রীতারক মোহন দাস**

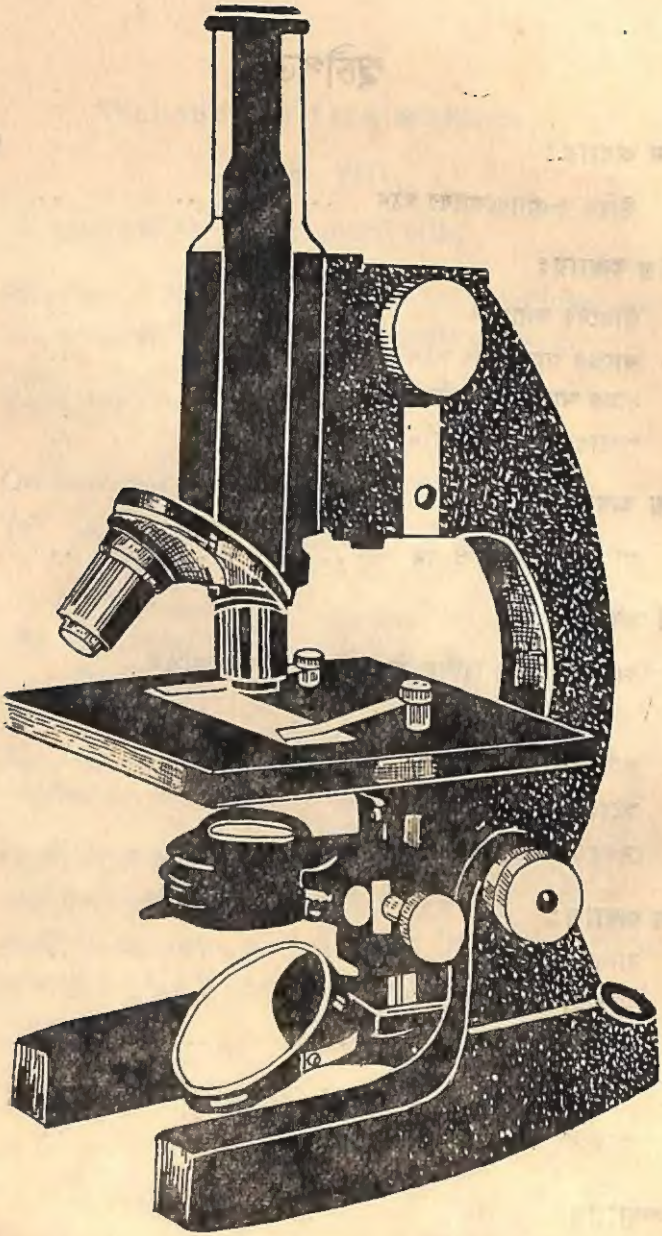

অণুবীক্ষণ যন্ত্র

INSTITUTE OF EDUCATION FOR WOMEN
Deptt of Extension Services.
CALCUTTA-27

প্রথম অধ্যায়

উদ্ভিদ ও প্রাণিকোষের গঠন

(Structure of Plant and Animal Cells)

জীবকোষ, জীবনের একক ঃ

পৃথিবীতে নানা রকম জীবাণু থেকে সুরু করে নানা বিচিত্র আকারের গাছপালা, কীটপতঙ্গ, মৎস্য-সরীসৃপ-পক্ষী ও মনুষ্যসমেত বহু রকম জীব সকলেই আজ একসঙ্গে বসবাস করছে। তাদের আকার ও জীবনধারা অত্যন্ত বৈচিত্র্যময় হলেও কতকগুলি মৌল বিষয়ে তাদের মধ্যে বিস্ময়কর সাদৃশ্য দেখা যায়, যা দেখে মনে হয় তারা যেন একই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ও পরস্পর নিবিড় আত্মীয়তা-সূত্রে আবদ্ধ। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের তলায় একটি উদ্ভিদের অংশ পরীক্ষা করলে দেখা যাবে তা অসংখ্য ছোট ছোট বাক্সের মত বস্তুর সাহায্যে তৈরী। এগুলিকে **কোষ** (Cell) বলে। একটি বাড়ী যেমন ছোট ছোট অসংখ্য ইটের সাহায্যে তৈরী, তেমনি পৃথিবীর বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষের সমন্বয়ে তৈরী। ইট যেমন বাড়ীর **একক** (Unit), তেমনি জীবদেহের **একক** (Unit) হল এই **কোষ** (Cell)। পৃথিবীর সকল জীবেরই দেহ, অতি সূক্ষ্ম জীবাণু থেকে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ প্রাণী নীল তিমির (Blue Whale) দেহ অবধি, এই একই মূল একক—জীবকোষের দ্বারা গঠিত। অ্যামিবা, ব্যাকটিরিয়া, ইউগলেনা প্রভৃতি নিম্নস্তরের জীবদেহ একটি মাত্র কোষের দ্বারা গঠিত, উচ্চস্তরের উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহ অসংখ্য কোষের দ্বারা গঠিত। আমাদের দেহের রক্তকণিকাগুলিও এক-একটি স্বতন্ত্র কোষ ছাড়া আর কিছু নয়।

জীবকোষের আবিষ্কার ঃ

তিনশ' বছরের কিছু বেশী সময় হল, 1665 খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত ইংরাজ বৈজ্ঞানিক **রবার্ট হুক** (Robert Hooke) প্রথম জীবকোষের

SYLLABUS IN LIFE SCIENCE

CLASS VIII

(1) Structure of plant and animal cells.

(2) Histology :—Plant tissue, structure of stem (dicot and monocot), root (dicot and monocot) and leaf.

(3) Animal tissues and organs.

(4) Outline idea of different systems with functions :—

(a) Invertebrate—cockroach and earthworm.

(b) Vertebrate—toad (frequent reference will have to be made to the organ systems in human being).

(5) Phenomenon of diffusion, osmosis, absorption, conduction and transpiration in plants.

(6) Students should acquire individual experience by experimentation on the following items :

Section of stem, root and leaf. External structure of cockroach. External structure and general viscera of toad.

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়ঃ পৃষ্ঠা

উদ্ভিদ ও প্রাণিকোষের গঠন 1

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ

উদ্ভিদের কলাস্থান 12

কাণ্ডের আভ্যন্তরীণ গঠন 17

মূলের আভ্যন্তরীণ গঠন 22

পাতার আভ্যন্তরীণ গঠন 24

তৃতীয় অধ্যায়ঃ

প্রাণিদেহের কলা ও অঙ্গ 28

চতুর্থ অধ্যায়ঃ

কয়েকটি প্রাণীর বিভিন্ন তন্ত্র ও তার কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ 40

অমেরুদণ্ডী : আরশোলা 40

অমেরুদণ্ডী : কেঁচো 48

মেরুদণ্ডী : কুনো ব্যাঙ 54

পঞ্চম অধ্যায়ঃ

ব্যাপন 72

অভিস্রবণ 73

শোষণ 79

পরিবহন 81

প্রস্বেদন 85

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ

পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা 88

আবিষ্কার করেন। তাঁর নিজের তৈরী একটি সাধারণ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের তলায় বোতলের ছিপি বা কর্কের (ওক গাছের ছাল থেকে

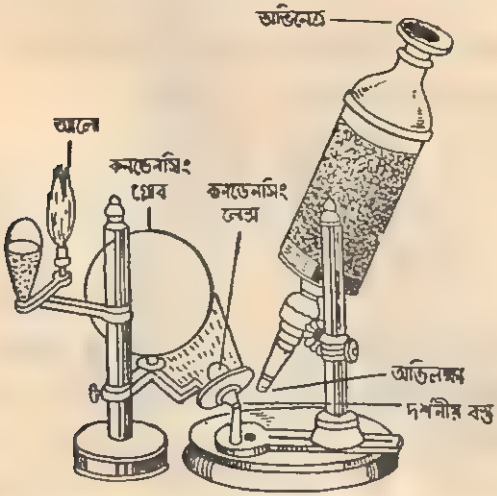

রবার্ট হুকের তৈরী অণুবীক্ষণ যন্ত্র

কর্ক তৈরী হয়) একটি ছেদ পরীক্ষা করে দেখেছিলেন তা অসংখ্য সারি সারি বাক্স বা ঘরের সাহায্যে গঠিত। তিনি সযত্নে তার ছবি এঁকেছিলেন এবং ঐ ঘরগুলির নাম দিয়েছিলেন সেল (Cell)। ইংলণ্ডে সেই যুগে ধর্মযাজকরা সারি সারি যে ঘরের মধ্যে বাস করতেন তারও নাম ছিল সেল। এই থেকেই তিনি ঐ নামকরণ করেন। রবার্ট হুক তাঁর সাদাসিধা অণুবীক্ষণ যন্ত্রের তলায় শুধু উদ্ভিদকোষের দেওয়ালগুলিই (Cell wall) দেখেছিলেন, ভিতরের কোন অংশ দেখা সম্ভব হয়নি। ছবিসহ উদ্ভিদকোষের এই বিবরণ তাঁর লেখা পুস্তক মাইক্রোগ্রাফিয়াতে 1665 খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশ করেন।

আমরা খালি চোখে সাধারণতঃ এক মিলিমিটারের দশ ভাগের এক ভাগের চেয়ে ছোট জিনিস দেখতে পাই না, কিন্তু অধিকাংশ জীবকোষই তার থেকে ছোট, খালি চোখে তাদের দেখা যায় না, তাই

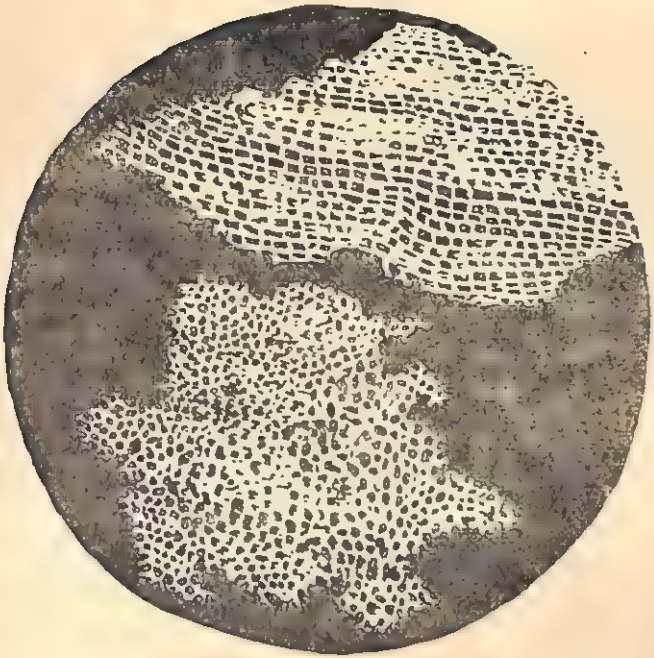

রবার্ট হুকের নিজের হাতে আঁকা জীবকোষের প্রথম ছবি
(বোতলের কর্কের প্রস্থচ্ছেদ থেকে)

অণুবীক্ষণ যন্ত্রের দরকার হয়। তবে খালি চোখে দেখা যায় এমন অনেক জীবকোষ আছে, যেমন পাখি ও অন্যান্য প্রাণীর অনিষিক্ত ডিম। পাখির একটি ডিম একটিমাত্র জীবকোষ, সেই হিসাবে উট পাখির ডিমকে পৃথিবীর সবচেয়ে বিরাট প্রাণিকোষ বলা যায়। তুলার আঁশগুলিও (Cotton fibre) এক-একটি স্বতন্ত্র কোষ, যার গড় দৈর্ঘ্য হল প্রায় 30 মিলিমিটার।

উদ্ভিদকোষ ঃ

একটি পেঁয়াজ সংগ্রহ কর। ঐ পেঁয়াজের একটি অংশ থেকে পাতলা একটি আঁশ তুলে একটি স্লাইড তৈরী কর (ছবি দেখ)। অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষা করে দেখ, ঐ পাতলা পেঁয়াজের আঁশটি অসংখ্য কোষের সাহায্যে গঠিত। প্রতিটি কোষ এক-একটি বাক্সের মত, তার

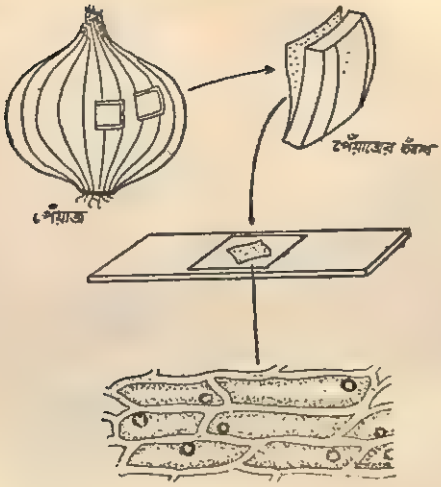

পেঁয়াজের আঁশ থেকে স্লাইড তৈরী এবং অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্যে পেঁয়াজকোষের দৃশ্য।

নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ আছে। প্রতিটি উদ্ভিদকোষ একটি পাতলা, স্বচ্ছ আবরণে ঢাকা থাকে। এই আবরণকে বলে কোষপ্রাচীর (Cell wall)। তরুণ কোষপ্রাচীর সেলুলোজ (Cellulose) নামক

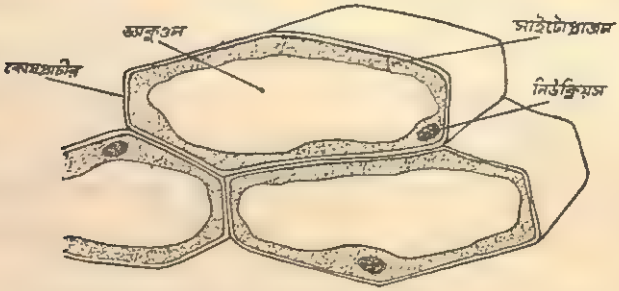

পেঁয়াজকোষগুলি আরো বড় করে দেখান হয়েছে। লক্ষ্য কর, এগুলির এক-একটি বাক্স বা ইঁটের মত দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ আছে।

এক রকম রাসায়নিক পদার্থের দ্বারা তৈরী। কোষপ্রাচীরটি ভিতরের জীবন্ত অংশকে রক্ষা করে এবং কোষের আকৃতি ও দৃঢ়তাদানে সহায়তা

করে। প্রাণিকোষের চারিপাশে এই ধরনের কোন কোষপ্রাচীর (Cell wall) নেই।

কোষপ্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত কোষের ভিতরে জেলির মত ঘন ও স্বচ্ছ পদার্থ **প্রোটোপ্লাজম** (Protoplasm) আছে। প্রোটোপ্লাজম কোষের **জীবন্ত পদার্থ** (Living matter)। প্রোটোপ্লাজমের প্রধান দুইটি অংশ, (1) **নিউক্লিয়স** সহ সূক্ষ্ম কণিকারাজী (Cell organelles) এবং (2) **সাইটোপ্লাজম** (Cytoplasm)। প্রোটোপ্লাজমের মধ্যে অপেক্ষাকৃত ঘন, গোলাকার অংশের নাম **নিউক্লিয়স** (Nucleus)। উদ্ভিদ ও প্রাণীর উভয়েরই কোষের এই প্রোটোপ্লাজমের উপর সূক্ষ্ম একটি পর্দা আছে, তাকে **প্রোটোপ্লাজমিক মেমব্রেন** (Protoplasmic membrane) বা **প্লাজমা মেমব্রেন** (Plasma membrane) বলে। এটি প্রোটোপ্লাজমেরই অংশ এবং জীবন্ত। এটি প্রয়োজন অনুসারে কোষের বাইরে থেকে কোষের মধ্যে নানারকম পদার্থের যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। কোষপ্রাচীরটির এই ধরনের কোন নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা নেই, তার মধ্য দিয়ে জল ও যাবতীয় দ্রবণ অনায়াসেই যাতায়াত করে থাকে। উদ্ভিদ ও প্রাণীর উভয়েরেই দেহের যাবতীয় বিক্রিয়ায় এই প্রোটোপ্লাজমিক মেমব্রেনের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

তোমার তৈরী স্লাইডে পেঁয়াজের আঁশের ওপর এক ফোঁটা আয়োডিন রং দাও। এবার প্রত্যেকটি কোষের মধ্যে একটি নিউক্লিয়স কালচে বাদামী রং ধারণ করে দৃশ্যমান হবে। কোষমধ্যস্থ নিউক্লিয়সকে ঘিরেও একটি **নিউক্লিয় মেমব্রেন** (Nuclear membrane) আছে যার মধ্যে ঘন **নিউক্লিয়প্লাজম** (Nucleoplasm) থাকে। নিউক্লিয়-প্লাজমের মধ্যে এক প্রকার সূক্ষ্ম সূতার মত পদার্থ জালের আকারে ছড়িয়ে থাকে। তাকে **নিউক্লিয় রেটিকিউলাম** (Nuclear reticulum) বলে। কোষ বিভাজনের সময় এই নিউক্লিয় রেটিকিউলাম ছোট ছোট খণ্ডে ভাগ হয়ে যায়, তার প্রত্যেকটি খণ্ডকে **ক্রোমোজোম** (Chromosome) বলে। সহজে রং ধরে বলে এর নাম দেওয়া হয়েছে

ক্রোমোজোম (Chromosome, গ্রীক শব্দ, Kroma=রঙ+Soma=দেহ)। এই ক্রোমোজোমগুলির সংখ্যা এক-এক জীবের এক-এক রকম। মানুষের দেহের ক্রোমোজোম সংখ্যা 23 জোড়া বা 46টি, ভুট্টা গাছের 5 জোড়া বা 10টি। এই ক্রোমোজোমগুলিই জীবের বৈশিষ্ট্য বংশপরম্পরায় বহন করে থাকে। ক্রোমোজোমের প্রধান উপাদান হল **DNA** (Deoxyribonucleic acid) ও প্রোটিন (Protein)। **DNA**ই জীবের নানারকম বৈশিষ্ট্যের ধারক ও বাহক। নিউক্লিয়সের মধ্যেও আবার এক বা একাধিক ঘন অংশ থাকে। তাকে বলে **নিউক্লিওলাস্** (Nucleolus)। নিউক্লিওলাসের মধ্যে **RNA** (Ribonucleic acid) তৈরী হয়। এই **RNA** কোষের মধ্যে প্রোটিন তৈরীতে সাহায্য করে। শুধু প্রোটিন নয়, কোষের মধ্যে নানারকম শর্করা, স্নেহজাতীয় পদার্থ ও অন্যান্য বহুরকম জৈব পদার্থ তৈরী হয়। তা ছাড়া জীবের বৃদ্ধি (Growth), শ্বসন (Respiration) ও কোষবিভাজন (Cell division) প্রভৃতি জৈব ক্রিয়া ঘটে থাকে কোষের সাহায্যেই।

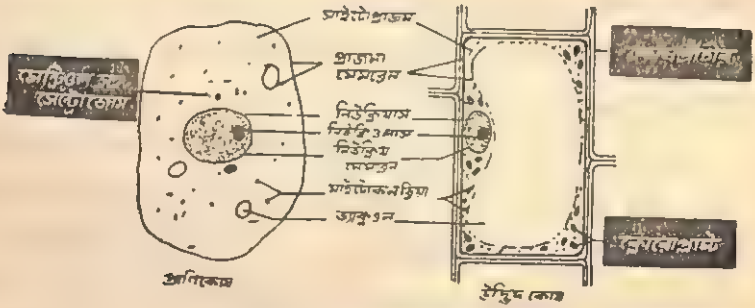

প্রাণিকোষ ও উদ্ভিদকোষের চিত্র।

সাদৃশ্যগুলি কেন্দ্রে ও পার্থক্যগুলি উভয় প্রান্তে দেখান হয়েছে।

এই সকল জৈব ক্রিয়া নিউক্লিয়সই নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। নিউক্লিয়সকে তাই বলা হয় কোষের নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র বা মস্তিষ্ক।

কোষের প্রোটোপ্লাজমের মধ্যে আরো কয়েক রকম সূক্ষ্ম কণিকা (Cell organelles) ছড়িয়ে থাকে, তার মধ্যে প্রধান হল **মাইটোকন-**

ড্রিয়ন (Mitochondrion, Plural—Mitochondria)। এরা দেখতে লম্বা রডের মত অথবা দানার মত। মাইটোকনড্রিয়নের মধ্যে শক্তি সঞ্চিত থাকে এবং শ্বাসক্রিয়ায় সহায়তা করে থাকে। একটি কোষে বহু মাইটোকনড্রিয়ন থাকে।

উদ্ভিদকোষের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল, প্রোটোপ্লাজমের মধ্যে **প্লাসটিডের** (Plastid) অবস্থান। এগুলিও এক প্রকার সূক্ষ্ম কণিকা। এই প্লাসটিডের মধ্যে **সবুজ কণা বা ক্লোরোফিল** (Chlorophyll) থাকে, আমরা তাই গাছের পাতার রং সবুজ দেখি। এই প্লাসটিডের মধ্যে যখন সবুজ ক্লোরোফিল থাকে তখন তাকে **ক্লোরোপ্লস্টা** (Chloroplast) বা **ক্লোরোপ্লাসটিড** (Chloroplastid) বলে। এই ক্লোরোপ্লাসটিডের মধ্যেই সূর্যকিরণের সাহায্যে শর্করা তৈরী হয়, যাকে আমরা **সালোকসংশ্লেষ** বা Photosynthesis বলি। এটি উদ্ভিদকোষের প্রধান বৈশিষ্ট্য, যা কোন প্রাণিকোষে হয় না।

প্লাসটিডের রং অনেক সময় হলুদ বা কমলা হয়, তাকে বলে **ক্রোমোপ্লাস্ট** (Chromoplast) বা **ক্রোমোপ্লাসটিড** (Chromoplastid)। ফুলের পাপড়িতে ক্রোমোপ্লাস্ট থাকে। যে প্লাসটিডের কোন রং নেই তাকে বলে **লিউকোপ্লাস্ট** (Leucoplast) বা **লিউকোপ্লাসটিড** (Leucoplastid)। সাধারণতঃ গাছের শিকড়ের মধ্যে **লিউকোপ্লাস্ট** দেখা যায়। প্রাণিকোষের মধ্যে কোন প্লাসটিড নেই।

কোষের প্রোটোপ্লাজমের মধ্যে এক বা একাধিক **গহ্বর বা ভ্যাকুওল** (Vacuole) থাকে, তার মধ্যে জল, নানারকম খাদ্যকণা ও অপ্রয়োজনীয় পদার্থ সঞ্চিত থাকে।

তরুণ উদ্ভিদকোষে অনেকগুলি ভ্যাকুওল থাকে, পরে সেগুলি মিলেমিশে একটি বড় কেন্দ্রীয় **ভ্যাকুওলে** (Central Vacuole) পরিণত হয়, তার চারপাশে প্রোটোপ্লাজমের পাতলা স্তর ঘিরে থাকে (ছবি দেখ)। প্রাণিকোষে ভ্যাকুওলের আকার অনেক ছোট এবং সংখ্যায় বেশী।

কোষের মধ্যে প্রোটোপ্লাজম কখনও স্থির থাকে না। সব সময়ই ধীরে ধীরে সঞ্চরণ করে, প্রোটোপ্লাজমের অন্তর্গত অন্যান্য সূক্ষ্ম কণিকাগুলিও সঞ্চরণশীল অবস্থায় থাকে। কোষের মৃত্যু ঘটলে এই সঞ্চরণ স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে যায়।

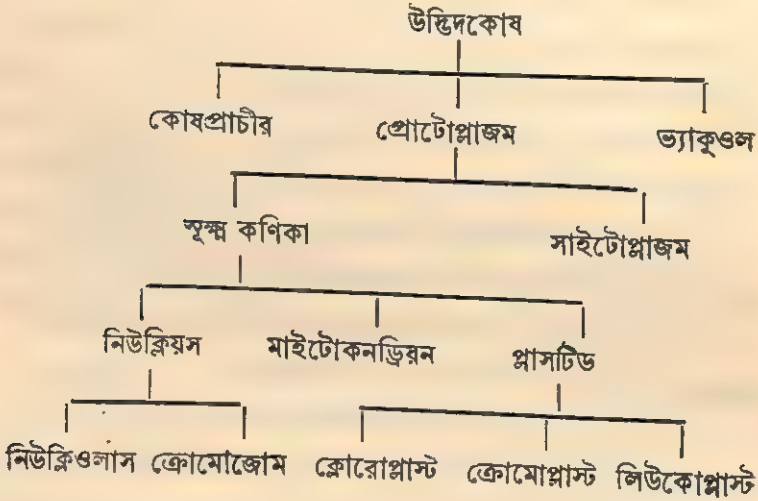

প্রাণিকোষের গঠন ঃ

তোমার হাতের আঙুলের ডগায় জীবাণুমুক্ত ছুঁচ (Sterilized needle) ফুটিয়ে এক ফোঁটা রক্ত একটি পরিষ্কার স্লাইডের ওপর নাও, তারপর আর একটি পরিষ্কার স্লাইডের শীর্ষদেশের সাহায্যে ঐ রক্তটি স্লাইডের ওপর ছড়িয়ে দাও এবং অণুবীক্ষণ যন্ত্রের তলায় স্লাইডটি পরীক্ষা করে দেখ। অসংখ্য গোল গোল রক্তকণিকা দেখা যাবে। এগুলি এক-একটি স্বতন্ত্র কোষ। লক্ষ্য কর, এই প্রাণিকোষের চারপাশে কোন কোষপ্রাচীর (Cell wall) নেই। এর **প্রোটো-প্লাজমিক মেমব্রেনটিই** (Protoplasmic membrane) কোষের ভিতরের অংশটিকে ঘিরে রাখে। উদ্ভিদকোষের সঙ্গে প্রাণিকোষের অধিকাংশ বিষয়েই মিল আছে, উভয়ের নিউক্লিয়স ও সাইটোপ্লাজমের

মধ্যে কোন মূলগত প্রভেদ নেই। প্রাণিকোষের মধ্যে কোন প্লাসটিড এবং ক্লোরোফিল নেই, তাই তারা সালোকসংশ্লেষ করতে অক্ষম। প্রাণিকোষের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল এতে সেন্ট্রোজোম (Centrosome) থাকে, এটি নিউক্লিয়সের নিকটে থাকে এবং এতে সেন্ট্রিওল (Centriole) আছে। কোষ-বিভাজনের সময় সেন্ট্রোজোমের ভূমিকা খুবই গুরত্বপূর্ণ। উদ্ভিদকোষের তুলনায় প্রাণিকোষে ভ্যাকুওলের (Vacuole) আকার অনেক ছোট এবং সংখ্যায় বেশী।

উদ্ভিদকোষ ও প্রাণিকোষের পার্থক্য

	উদ্ভিদকোষ	প্রাণিকোষ
১।	কোষপ্রাচীর আছে	কোষপ্রাচীর নেই
২।	প্লাসটিড আছে	প্লাসটিড নেই
৩।	সেন্ট্রোজোম নেই	সেন্ট্রোজোম আছে
৪।	ভ্যাকুওল আয়তনে বড় কিন্তু সংখ্যায় কম	ভ্যাকুওল আয়তনে ছোট কিন্তু সংখ্যায় বেশী

জীবকোষের রাসায়নিক উপাদান

জীবকোষের মধ্যে বহুবিধ জৈব পদার্থ পাওয়া যায়, তা প্রধানতঃ হল শ্বেতসারজাতীয় পদার্থ (Carbohydrates), স্নেহ ও তৈলজাতীয় পদার্থ (Fats and Oils), প্রোটিন (Protein) ও নিউক্লিক অ্যাসিড (Nucleic acid)। জীবকোষের প্রোটোপ্লাজম প্রোটিনজাতীয় পদার্থে তৈরী। জীবকোষের জলের পরিমাণ সাধারণতঃ শতকরা 70 থেকে 95 ভাগ। জীবকোষকে রাসায়নিক বিশ্লেষণ করলে যে 10টি প্রধান মৌল পদার্থ পাওয়া যায় তা হল কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, ফসফরাস, সালফার, পটাশিয়াম, নাইট্রোজেন, ক্যালসিয়াম, আয়রন ও ম্যাগনেসিয়াম। এই মৌল পদার্থগুলির নাম সহজে মনে রাখবার জন্য একটি সাংকেতিক নাম মনে রাখা যেতে পারে। তা হল :

C. HOPSKN Ca, Fe, Mg.

এই প্রধান মৌল পদার্থগুলির কোন একটির অভাব হলে জীবকোষের পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। এই মৌল পদার্থগুলির সহায়তায়ই কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ফ্যাট ইত্যাদি যাবতীয় জৈব পদার্থ উদ্ভিদ-কোষের মধ্যে তৈরী হয়। উদ্ভিদকোষের মধ্যে উৎপন্ন ঐ সব জৈব পদার্থ আহার করেই অন্যান্য প্রাণীরা বেঁচে থাকে।

জীবনের মৌল বৈশিষ্ট্য ঃ

এই কোষের মধ্যেই জীবদেহের যাবতীয় জটিল বিক্রিয়া ঘটে থাকে। পরিবেশের নানা রকম উপাদানের সহায়তায় অসংখ্য জৈব পদার্থ তৈরী হয় এই কোষের মধ্যেই, সেই সঙ্গে জীবের পরিপাক, পুষ্টি, বৃদ্ধি, বংশবৃদ্ধি, শ্বাসকার্য সবই ঘটে এই কোষের মধ্যে এবং এই কোষের সাহায্যে। এই প্রসঙ্গে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল **এইসব জৈব বিক্রিয়ার মূল বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি সকল জীবেরই এক।** উদ্ভিদ ও প্রাণীর শ্বাসকার্য, মৎস্য ও মানুষের পুষ্টি, ছুঁচো ও তিমির সংবহনতন্ত্রে বিশেষ কোন মৌল প্রভেদ নেই। দ্বিতীয়তঃ কোষের মধ্যে এই জৈব ক্রিয়াগুলি এমন সুচারুভাবে নিষ্পন্ন হয় যা শুধু প্রাণীর আত্মনির্ভরতায় সাহায্য করে তাই নয়, অন্যান্য প্রাণীর জীবনধারণেরও সহায়ক হয়। যেমন, উদ্ভিদরা যা ফলমূল, শস্য উৎপন্ন করে, তা সংগ্রহ করে অন্যান্য প্রাণীরা জীবন ধারণ করে। আবার ঐ সকল প্রাণীদের শ্বাসকার্যের ফলে যে কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয়, তা সংগ্রহ করে উদ্ভিদরা বেঁচে থাকে এবং ঐ ফলমূল, শস্য উৎপাদন করে থাকে। সুতরাং পৃথিবীর সকল জীবের মধ্যে আত্মীয়তার সীমা যে শুধু তাদের প্রোটোপ্লাজমের গঠন ও নানা রকম জৈব ক্রিয়ার সাদৃশ্যের মধ্যেই সীমবদ্ধ তা নয়, বরং তা আরো অর্থপূর্ণ, গভীরতর মাত্রায় পরিব্যাপ্তি লাভ করেছে। **পৃথিবীর সকল জীবেরই জীবনধারণের মূল ভিত্তি গড়ে উঠেছে অন্যান্য জীবের নানারকম জৈব ক্রিয়ার ওপর নির্ভর করে, অর্থাৎ প্রত্যেক জীবের অস্তিত্ব নির্ভর করছে**

অন্যের অস্তিত্বের ওপর। পৃথিবীতে কোন জীবই স্বয়ম্ভূ নয়, স্বয়ং-সম্পূর্ণও নয়। প্রত্যেক জীবই বহু বিচিত্র পদ্ধতিতে অন্যান্য জীবকে সাহায্য করে থাকে এবং বহু অভিনব উপায়ে অপরিমেয় সাহায্য নিয়েও থাকে, যার ফলে এই পৃথিবীতে সকলেরই অস্তিত্ব রক্ষা করা সম্ভব হয়। এই পরস্পর নির্ভরতাও ব্যাপক অর্থে জীবনের অন্যতম মৌল বৈশিষ্ট্য।

অনুশীলনী

1. কোষকে জীবদেহের একক বলা হয় কেন? জীবকোষের আবিষ্কারকের নাম লেখ। অল্প কথায় তাঁর আবিষ্কারের ঘটনাটি বর্ণনা কর। জীবকোষ দেখতে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের প্রয়োজন হয় কেন? খালি চোখে দেখা যায় এমন একটি উদ্ভিদকোষ ও একটি প্রাণিকোষের নাম লেখ।
2. একটি জীবকোষের ছবি আঁক ও তার বিভিন্ন প্রধান অংশগুলির নাম ছবিতে দেখাও ও তাদের কার্য বর্ণনা কর।
3. একটি উদ্ভিদকোষ ও একটি প্রাণিকোষের ছবি আঁক ও তাদের প্রধান অংশগুলির নাম ছবিতে দেখাও। দুইটি কোষের পার্থক্য বর্ণনা কর।
4. জীবকোষ যে প্রধান দশটি মৌল পদার্থে গঠিত তাদের নাম উল্লেখ কর। জীবকোষের প্রধান জৈব উপাদানগুলির নাম লেখ।
5. জীবনের মৌল বৈশিষ্ট্য বলতে কি বোঝ? কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে তা বুঝিয়ে দাও।
6. টীকা লেখ:
   নিউক্লিয়স, প্লাসটিড, ক্রোমোজোম, মাইটোকনড্রিয়া, প্রোটোপ্লাজমিক মেমব্রেন ও সাইটোপ্লাজম।

INSTITUTE OF EDUCATION FOR WOMEN, 3383 Deptt of Extension Services 22/3/76 CALCUTTA-27

দ্বিতীয় অধ্যায়

উদ্ভিদের কলাস্থান

(Plant Histology)

উদ্ভিদের দেহ অসংখ্য কোষের (Cell) সমন্বয়ে তৈরী। গাছের কাণ্ডের ডগা ও শিকড়ের ডগাগুলি খুব নরম, হাতের আঙ্গুলের চাপেই ভেঙ্গে যায়। কাণ্ডের গোড়াটি কিন্তু খুব শক্ত। আম, জামের মত বড় গাছ হলে কুড়ুলের প্রয়োজন হয় তা কাটবার জন্য। তোমরা একটা জিনিস লক্ষ্য কর, আমাদের দেহের মধ্যে যেমন একটা হাড়ের কঙ্কাল আছে, যার সাহায্যে দেহটা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, উদ্ভিদের দেহের মধ্যে তেমন কোন কঙ্কাল নেই; অথচ আম, জাম, তাল, নারিকেল বড় বড় গাছগুলি কেমন শক্ত ও সোজাভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। এদের গুঁড়ির কোষসমষ্টিগুলি নিশ্চয়ই অত্যন্ত কঠিন, তাই গাছের গুঁড়িটি অত শক্ত। কাণ্ড ও শিকড়ের ডগার কোষগুলি নিশ্চয়ই খুব নরম তাই সহজেই তা ভাঙ্গা যায়। উদ্ভিদের দেহের মধ্যে কোষ ছাড়া আর কিছু নেই, তা হলে দেখা যাচ্ছে—এই কোষগুলি দেহের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন আকারের এবং বিভিন্ন প্রকারের (নরম বা কঠিন) এবং বিভিন্ন রকম কাজ করে থাকে, অর্থাৎ একই কোষ তরুণ অবস্থায় এক রকম কাজ করে, পরিণত অবস্থায় অন্য রকম কাজ করে থাকে।

আমরা উদ্ভিদকোষের গঠন আলোচনার সময় জেনেছি প্রত্যেকটি কোষের চারিপাশে একটা কোষপ্রাচীর আছে, তরুণ কোষগুলির প্রাচীর নরম সেলুলোজে (Cellulose) তৈরী, তাই সহজেই তা ভাঙ্গা যায়। কিন্তু ঐ কোষগুলির বয়স যখন ক্রমশঃ বাড়ে, তখন ঐ নরম কোষপ্রাচীরের ভেতরের গায়ে প্রোটোপ্লাজম (Protoplasm) থেকে নিঃসৃত নানা রকম রাসায়নিক পদার্থ সঞ্চিত হতে থাকে। তার ফলে কোষপ্রাচীরগুলি ক্রমশঃ মোটা ও শক্ত হতে থাকে, প্রোটোপ্লাজমের

পরিমাণ কিন্তু ক্রমশঃ কমে আসে এবং কোষগুলির অবশেষে মৃত্যু ঘটে। এই সঞ্চিত রাসায়নিক পদার্থের মধ্যে অন্যতম প্রধান হল লিগনিন (Lignin)। আমরা গাছের গুঁড়ি কাটলে যে শক্ত কাঠ পাই তার প্রায় সবটাই এই লিগনিনের তৈরী কোষপ্রাচীরের সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই নয়। লিগনিনের তৈরী কোষপ্রাচারগুলি গুঁড়িটিকে কাঠিন্য দান করে। গাছের ছালের কোষপ্রাচীরের গায়ে কর্ক বা সুবেরিন (Suberin) নামে আর এক রকম জলনিরোধক পদার্থ জমা হয়, যার ফলে বাইরে থেকে জল সহজে গাছের গুঁড়ির মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না, ভেতরের জলও বেরিয়ে যেতে পারে না। কোন কোন গাছের ছালে এই কর্ক এত পুরু হয়ে জমা হয় যা থেকে বোতলের ছিপি তৈরী হয়। রবার্ট হুক (Robert Hooke) এই রকম একটি কর্কের ছিপি থেকেই প্রথম জীবকোষের সন্ধান পেয়েছিলেন সে কথা আগেই বলা হয়েছে। কাণ্ড ও পাতার ত্বকের (Cuticle) কোষপ্রাচীরগুলির গায়ে কিউটিন (Cutin) নামে আর এক রকম পদার্থ জমা হয়। এই কিউটিনের মধ্যদিয়ে জল সহজে যাতায়াত করতে পারে না, তার ফলে উদ্ভিদের দেহ থেকে জলের অপচয় হ্রাস পায়।

উদ্ভিদের দেহকোষগুলিকে আরও কয়েক রকম বিশেষ কাজ করতে দেখা যায়। মাটি থেকে জল ও সারপদার্থ দেহের সর্বত্র সরবরাহের জন্য কয়েক রকম কোষ পর পর জুড়ে দীর্ঘ নলিকার সৃষ্টি হয়, যাকে বলা হয় জাইলেম (Xylem) নলিকা। তেমনি গাছের পাতায় যে খাদ্য তৈরী হয় তা বর্ধনশীল অংশগুলিতে চালান দেবার জন্য কয়েক রকম কোষ পরস্পর জোড়া বেঁধে ফ্লোয়েম (Phloem) নলিকা তৈরী হয়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে উদ্ভিদ দেহে বিভিন্ন রকম কাজের জন্য বিভিন্ন রকম কোষসমষ্টি আছে। এই এক এক রকম কোষসমষ্টিকে এক একটি কলা বা টিস্যু (Tissue) বলে (Tissue: ল্যাটিন

Texo = বয়ন করা)। একটি কলা বা টিস্যু (Tissue) যে সকল কোষ নিয়ে তৈরী তারা সাধারণতঃ একই রকম দেখতে হয়, একই রকম কাজ করে এবং তাদের উৎপত্তিস্থানও একই হয়। তাই বলা যায়, **আকৃতি, কাজ ও উৎপত্তিস্থান একই এমন কতকগুলি কোষের সমষ্টিকে কলা বা টিস্যু (Tissue) বলে।**

জীববিজ্ঞানের যে বিভাগে উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহকলা বা টিস্যু (Tissue) সম্পর্কে আলোচনা করা হয় তাকে বলে **কলাস্থান বা হিস্টোলজি** (Histology)।

উদ্ভিদের দেহকলা দুইটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত : (1) **ভাজক কলা বা মেরিস্টেম্যাটিক টিস্যু** (Meristematic tissue); (2) **স্থায়ী কলা বা পারমানেন্ট টিস্যু** (Parmanent tisssue)।

ভাজক কলা : উদ্ভিদের শিকড়ের ডগা ও কাণ্ডের ডগার কোষগুলি অতি তরুণ ও বর্ধনশীল এবং তারা বিভক্ত হয়ে আরো আপত্য কোষ তৈরী করতে পারে। তাই তাদের বলা হয় ভাজক কলা বা মেরিস্টেম্যাটিক টিস্যু (Meristematic tissue)। শিকড় ও কাণ্ডের প্রান্ত ছাড়াও পর্বসন্ধি (Node) ও কাণ্ডের বিশেষ অংশে ভাজক কলা থাকে ; সেখান থেকে নূতন নূতন কোষ তৈরী হয়, নূতন শাখা-প্রশাখা নির্গত হয়। কাণ্ডের ক্যামবিয়াম কলা (Cambium tissue) এই ভাজক কলার অন্তর্গত।

স্থায়ী কলা : যে কলার কোষগুলি পরিণত অবস্থায় পৌঁছেছে, যাদের বিভক্ত হবার আর কোন ক্ষমতা নেই, তাদের স্থায়ী কলা বা পারমানেন্ট টিস্যু (Parmanent tissue) বলে। লিগনিনযুক্ত গাছের গুঁড়ির মৃত কোষগুলি এই স্থায়ী কলার অন্তর্গত।

বিভিন্ন রকম স্থায়ী কলা : স্থায়ী কলা দুই প্রকারের। 1. **সরল কলা** (Simple tissue)। 2. **জটিল কলা** (Complex tissue)।

যখন একই আকৃতির কোষ দিয়ে তৈরী স্থায়ী কলা একই কাজ করে তাকে বলা হয় সরল কলা। সরল কলা তিন প্রকার :

প্যারেনকাইমা (Parenchyma), কোলেনকাইমা (Collenchyma) ও স্ক্লেরেনকাইমা (Sclerenchyma)।

প্যারেনকাইমা (Parenchyma) : সেলুলোজের তৈরী পাতলা কোষপ্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত জীবন্ত কোষসমষ্টিকে প্যারেনকাইমা কলা বলে। কোষগুলি গোলাকার বা ডিম্বাকার এবং এই সব কোষের অন্তর্বর্তী স্থান (Intercellular space) ফাঁকা থাকে। সাধারণতঃ গাছের কোমল অংশ এই কলা দ্বারা গঠিত।

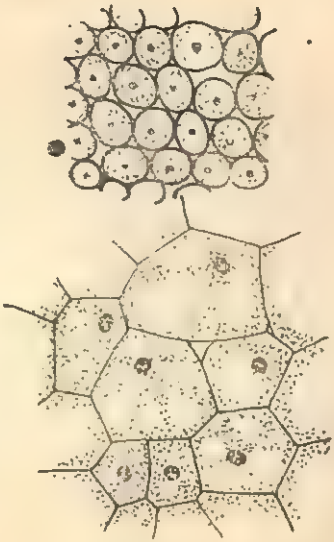

প্যারেনকাইমা কলা

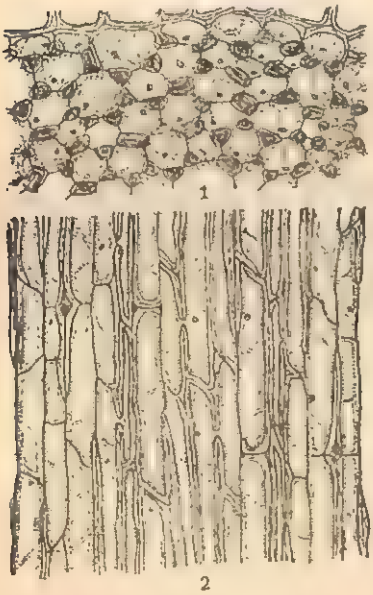

(1) কোলেনকাইমা কলার প্রস্থচ্ছেদ
(2) কোলেনকাইমা কলার লম্বচ্ছেদ

কোলেনকাইমা (Collenchyma) : এই কলা লম্বাটে ধরনের কোষে তৈরী, কোষপ্রাচীর পাতলা, কিন্তু কোষের প্রতিটি কোণ স্থূল, তাই গাছকে কিছুটা দৃঢ়তা দান করে। এর কোষগুলিও জীবন্ত এবং তার মধ্যে ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে, তাই এরা খাদ্য তৈরী করতে পারে। ত্বকের নীচেই এই কলার অবস্থিতি।

স্ক্লেরেনকাইমা (Sclerenchyma) : এই কলার কোষগুলির প্রাচীর অত্যন্ত মোটা ও লিগনিন দ্বারা তৈরী। কোষে কোন প্রোটোপ্লাজম থাকে না, সেজন্য কোষগুলি মৃত। গাছের গুঁড়ির কাঠিন্য ও দৃঢ়তা এই কলার জন্যই হয়। এটা মনে রাখা দরকার একই প্যারেনকাইমা টিস্যু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ মৃত স্ক্লেরেনকাইমা টিস্যুতে পরিণত হতে পারে।

স্ক্লেরেনকাইমা কলার প্রস্থচ্ছেদ ও লম্বচ্ছেদ

জটিল কলা (Complex tissue) : যে কলার কোষগুলির গঠন এক প্রকার নয় কিন্তু তাদের উৎপত্তিস্থান এক এবং তারা সকলে মিলে একটি নির্দিষ্ট কাজ করে, তাকে **জটিল কলা** বলে। **উদ্ভিদদেহে জাইলেম** (Xylem) **ও ফ্লোয়েম** (Phloem) **নলিকা এই জটিল কলার অন্তর্গত**। জাইলেম ও ফ্লোয়েম উভয়ই বিভিন্ন রকম কোষ দ্বারা গঠিত। জাইলেমের মধ্য দিয়ে উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশে জল ও লবণ সরবরাহ হয়। ফ্লোয়েমের মধ্য দিয়ে পাতায় তৈরী খাদ্য বিভিন্ন অংশে সরবরাহ হয়। উদ্ভিদের দেহে গুচ্ছ বা বাণ্ডিলের আকারে এই জাইলেম ও ফ্লোয়েম নলিগুলি থাকে, তাই এদের বলা হয় **ভ্যাসকুলার বাণ্ডল** (Vascular bundle)।

কাণ্ডের আভ্যন্তরীণ গঠন
(Internal Structure of Stem)

দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ড

সূর্যমুখী ফুলের গাছের একটি কচি কাণ্ডের টুকরো সংগ্রহ কর, তা থেকে সাবধানে কতকগুলি প্রস্থচ্ছেদ কাট এবং ঐগুলি একটি

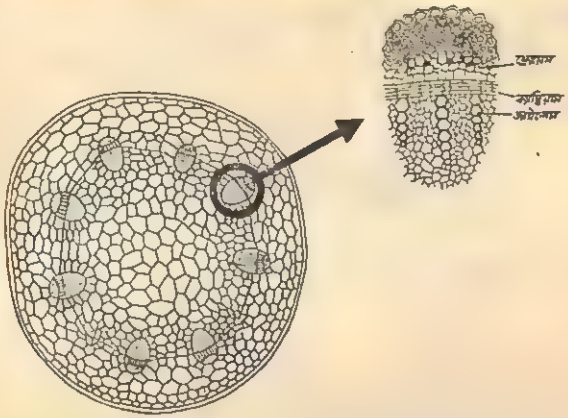

ফ্লোয়েম ও জাইলেম জটিল কলা, এই কলার সাহায্যে ভ্যাসকুলার বাণ্ডল গঠিত। ভ্যাসকুলার বাণ্ডলগুলি দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ডে চক্রাকারে সাজান থাকে।

পাত্র বা ওয়াচ-গ্লাসের জলের মধ্যে রাখ। ঐগুলি থেকে একটি সর্বাংশে সমান পাতলা ছেদ (Section of uniform thickness) বেছে নিয়ে এক ফোঁটা জলের সঙ্গে স্লাইডের ওপর রাখ, কভার স্লিপ চাপা দাও এবং অণুবীক্ষণ যন্ত্রের তলায় পরীক্ষা করে দেখ। এই ছেদটি প্রায় গোলাকার এবং কতকগুলি কলার সাহায্যে গঠিত, সেগুলি হল :—

I. বহিঃত্বক (Epidermis) : কাণ্ডের বাইরের দিক একটি মাত্র কোষস্তরে গঠিত। এটি প্যারেনকাইমা কলা, এর ওপর পাতলা কিউটিক্‌ল-এর একটি আবরণী আছে এবং কতকগুলি বহুকোষী রোম আছে।

II. কর্টেক্স : (Cortex) : বহিঃত্বকের ভিতরে স্টেলি (Stele) পর্যন্ত বিস্তৃত অংশকে কর্টেক্স (Cortex) বলে (ছবি দেখ)। কর্টেক্স-এর অংশগুলি হল : (1) অধঃত্বক (Hypodermis), এটি বহিঃত্বকের

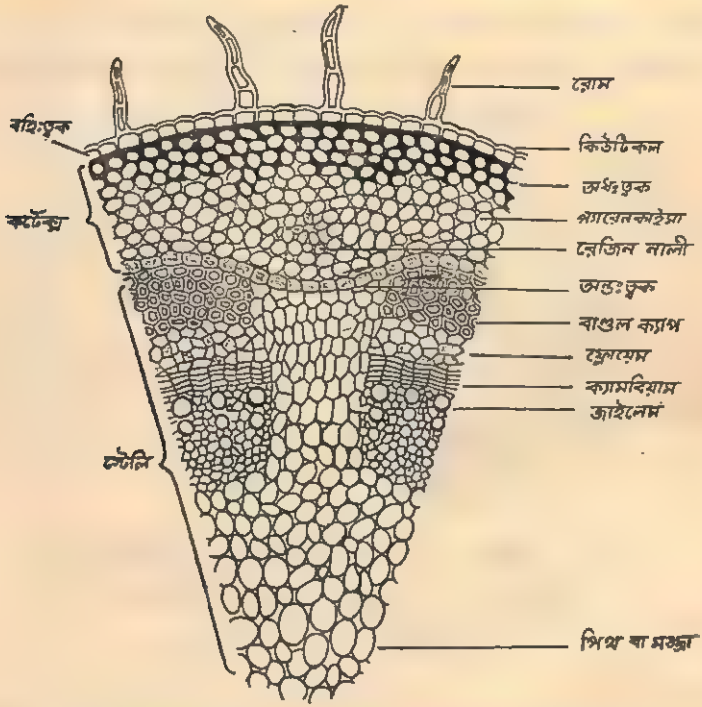

দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ সূর্যমুখীর কচি কাণ্ডের প্রস্থচ্ছেদ (আংশিক)

ভিতরে কয়েক স্তর কোলেনকাইমা দিয়ে গঠিত। (2) প্যারেনকাইমা অংশ, অধঃত্বকের ভিতর বড় আকারের প্যারেনকাইমা দিয়ে গঠিত, এখানে একাধিক রেজিন নালী আছে। (3) অন্তঃত্বক (Endodermis) বা স্টার্চ সিথ্ (Starch Sheath), এটি কর্টেক্স-এর সবচেয়ে ভিতরের স্তর, অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যময় ও ঢেউখেলান আকৃতির। এই স্তরের কোষগুলির মধ্যে প্রচুর শ্বেতসার-কণিকা পাওয়া যায় এবং আয়োডিন রং ছোঁয়ালে এগুলি নীলবর্ণ ধারণ করে।

III. স্টেলি (Stele) : কর্টেক্স-এর পর স্টেলি বা কেন্দ্রের

অংশ। স্টেলির মধ্যে অনেকগুলি ভ্যাসকুলার বাণ্ডল (Vascular bundle) চক্রাকারে সাজানো থাকে, দ্বিবীজপত্রী কাণ্ডের এইটিই বৈশিষ্ট্য। প্রত্যেক বাণ্ডল-এর মাথায় অর্থাৎ বাইরের দিকে কতকগুলি স্ক্লেরেনকাইমার স্তর থাকে, এগুলিকে বাণ্ডল ক্যাপ (Bundle Cap) বলে। এগুলিকে বিশেষ প্রকার পেরিসাইক্‌ল্ বলা যায়। ভ্যাসকুলার বাণ্ডল-এর প্রত্যেকটিতে থাকে : (1) ফ্লোয়েম (Phloem), বাণ্ডল ক্যাপের ভিতর দিকে অবস্থিত কোষসমষ্টি, এর মধ্য দিয়ে

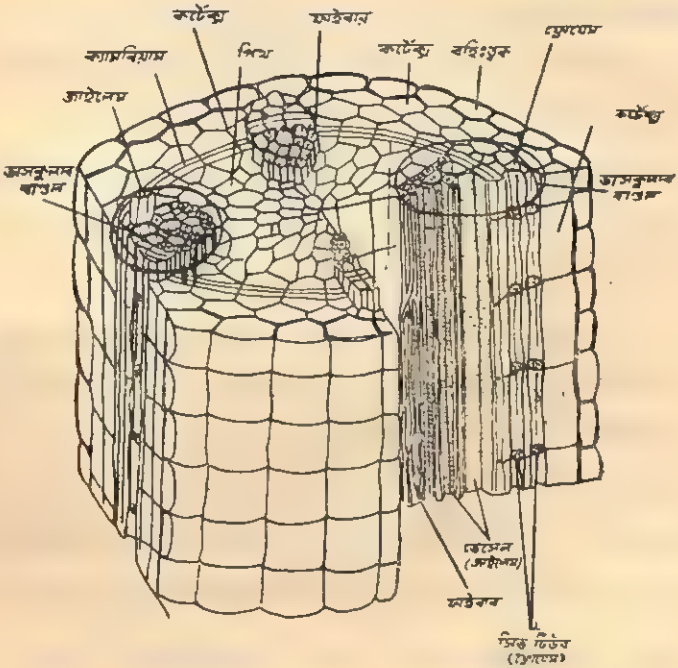

দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ডে ভ্যাসকুলার বাণ্ডলের লম্বচ্ছেদ ও অন্যান্য কলার অবস্থান দেখান হয়েছে।

খাদ্যবস্তু সরবরাহ হয়। এর কোষগুলি জীবিত। (2) জাইলেম (Xylem) : বাণ্ডল-এর ভিতরের দিকে অর্থাৎ কেন্দ্রের দিকে থাকে জাইলেম, এর মূল কোষগুলি মৃত, এর মধ্য দিয়ে জল ও লবণ সরবরাহ হয়। এগুলিকে ভেসল বলা হয়। (3) ক্যামবিয়াম

(Cambium) : ফ্লোয়েম ও জাইলেমের অন্তর্বর্তী স্থানে আয়তাকার জীবিত কোষের কয়েকটি স্তর নিয়ে ক্যামবিয়াম গঠিত, এটি ভাজক কলা, সুতরাং ক্যামবিয়াম থেকে নূতন নূতন জাইলেম ও ফ্লোয়েম তৈরী হয়। দ্বিবীজপত্রী কাণ্ডের এটি একটি বৈশিষ্ট্য। (4) পিথ (Pith) বা মজ্জা, স্টেলির কেন্দ্রে এটি প্যারেনকাইমা কলা দিয়ে গঠিত।

একবীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ড :

ভুট্টা গাছের কচি কাণ্ডের একটি প্রস্থচ্ছেদ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের তলায় পরীক্ষা করে দেখ। নিম্নলিখিত অংশগুলি দেখতে পাবে :

I. **বহিঃত্বক** (Epidermis) : কাণ্ডের বাইরের দিকে এক সারি কোষদ্বারা গঠিত। এর ওপর কিউটিকল্-এর একটি আবরণ আছে কিন্তু কোন রোম নেই।

II. **কর্টেক্স** (Cortex) : এখানে কর্টেক্স দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ডের মত পরিষ্কারভাবে আলাদা করা যায় না। বহিঃত্বকের ঠিক তলায় কয়েক স্তর পুরু প্রাচীরবিশিষ্ট স্ক্লেরেনকাইমা কলা দ্বারা গঠিত, এটাই হল অধঃত্বক। অধঃত্বকের ভিতরে পরিধি থেকে পরিধি পর্যন্ত বিস্তৃত প্যারেনকাইমা আছে। এটিকে বলে **গ্রাউণ্ড টিস্যু** (Ground tissue) বা **জেনারেল কর্টেক্স** (General cortex)।

III. **ভ্যাসকুলার বাণ্ডল** (Vascular bundle) : গ্রাউণ্ড টিস্যুর সর্বত্র ভ্যাসকুলার বাণ্ডলগুলি এলোমেলোভাবে ছড়ান থাকে, এটি একবীজপত্রী উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য। ভ্যাসকুলার বাণ্ডল-এর ওপর দিকে ফ্লোয়েম ও নীচের দিকে জাইলেম থাকে। ফ্লোয়েম ও জাইলেমের মধ্যে কোন ক্যামবিয়াম নেই, এটাও একবীজপত্রী গাছের একটি উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব। প্রত্যেকটি ভ্যাসকুলার বাণ্ডল আলাদা আলাদা হয়ে স্ক্লেরেনকাইমা কলায় ঢাকা থাকে।

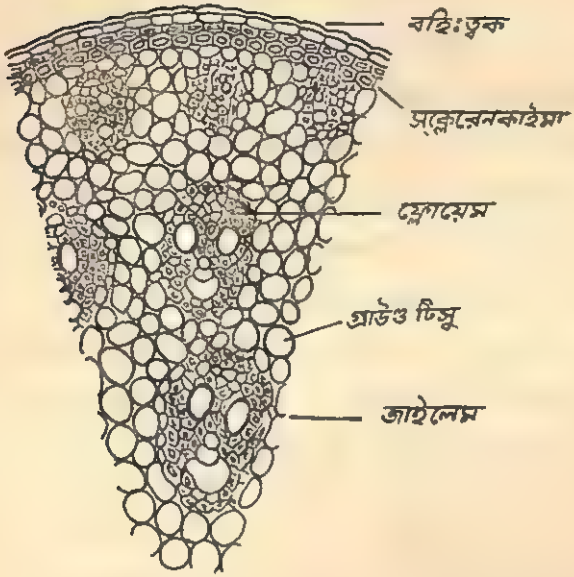

একবীজপত্রী উদ্ভিদ ভুট্টার কচি কাণ্ডের প্রস্থচ্ছেদ (আংশিক)

দ্বিবীজপত্রী ও একবীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ডের কয়েকটি প্রধান পার্থক্য

দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ড	একবীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ড
1. বহিঃত্বকে রোম আছে,	বহিঃত্বকে রোম নেই।
2. অন্তঃত্বক আছে,	অন্তঃত্বক নেই।
3. ভ্যাসকুলার বাণ্ডল চক্রাকারে সাজান থাকে,	ভ্যাসকুলার বাণ্ডল এলোমেলো-ভাবে ছড়ান থাকে।
4. ফ্লোয়েম ও জাইলেমের মাঝে ক্যামবিয়াম আছে,	ফ্লোয়েম ও জাইলেমের মাঝে ক্যামবিয়াম নেই।

মূলের আভ্যন্তরীণ গঠন

(Internal Structure of Root)

দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের মূল ঃ

একটি ছোলাগাছের কচি শিকড় থেকে পাতলা একটি প্রস্থচ্ছেদ নাও। ছেদটি সেফ্রানিন রং-এ ডুবিয়ে স্লাইডের ওপর রাখ এবং কভার স্লিপ চাপা দাও। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এবার পরীক্ষা কর। নিম্নলিখিত অংশগুলি দেখতে পাবে।

I. বহিঃত্বক (Epidermis) ঃ বাইরের স্তরটি এক সারিতে সাজান পাতলা প্যারেনকাইমা দিয়ে গঠিত, এটাই হল বহিঃত্বক বা এপিব্লেমা। বহিঃত্বকে কতকগুলি এককোষী মূলরোম আছে।

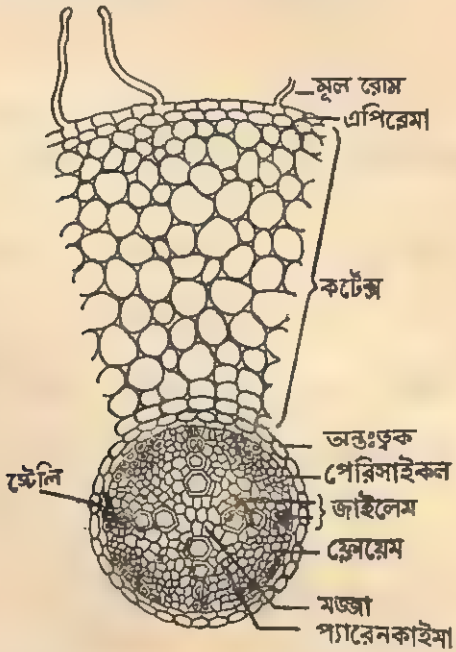

দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ ছোলার কচি মূলের প্রস্থচ্ছেদ (আংশিক)

II. **কর্টেক্স (Cortex) :** বহিঃত্বকের ভিতরের কোষগুলি বড়

আকারের প্যারেনকাইমা দিয়ে গঠিত, এই অংশ বেশ বিস্তৃত। কর্টেক্সের ভিতর এক সারিতে সাজান ব্যারেলাকৃতির স্তরটিকে অন্তঃত্বক বলে।

III. **স্টেলি** (Stele) : এটি মূলের কেন্দ্রীয় অংশ। অন্তঃত্বকের ভিতর এই অংশ থাকে। এটি নিম্নলিখিত অংশ দ্বারা গঠিত : (1) **পেরিসাইকল**—পাতলা কোষপ্রাচীরবিশিষ্ট একটি কোষস্তর স্টেলিকে ঘিরে থাকে। (2) **ভ্যাসকুলার বাণ্ডল**—চারিটি জাইলেমগুচ্ছ এবং এগুলির অন্তর্বর্তী স্থানে চারিটি ফ্লোয়েমগুচ্ছ নিয়ে ভ্যাসকুলার বাণ্ডল বর্তমান। (3) **পিথ** (Pith) বা **মজ্জা**—মূলের কেন্দ্রস্থলে ঘনসন্নিবিষ্ট প্যারেনকাইমা দিয়ে গঠিত পিথ বা মজ্জা আছে।

একবীজপত্রী উদ্ভিদের মূল :

পূর্ববর্ণিত পদ্ধতিতে কচি ভুট্টামূলের একটি প্রস্থচ্ছেদ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের তলায় পরীক্ষা করলে নিম্নলিখিত অংশগুলি দেখা যাবে।

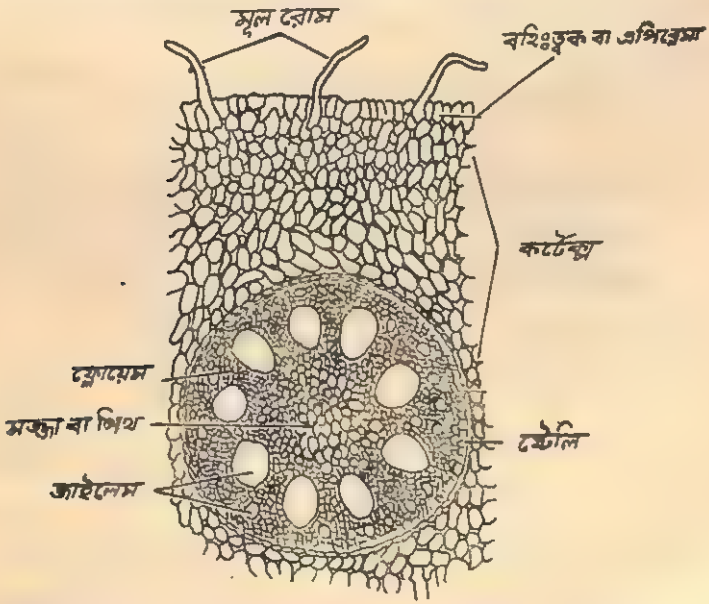

একবীজপত্রী উদ্ভিদ ভুট্টার কচি মূলের প্রস্থচ্ছেদ (আংশিক)

I. **বহিঃত্বক** (Epidermis, also known as Epiblema) : এক সারি প্যারেনকাইমা দিয়ে তৈরী এই স্তরকে বলে বহিঃত্বক। এই স্তরের কতকগুলি কোষ বাইরের দিকে প্রসারিত হয়ে এককোষী মূল রোম তৈরী করে।

II. **কর্টেক্স** (Cortex) : বহিঃত্বকের নীচে কর্টেক্স প্যারেনকাইমা কলা দ্বারা গঠিত, দ্বিবীজপত্রী মূলের চেয়ে এটি অধিক বিস্তৃত এবং সবচেয়ে ভিতরের স্তরটি ব্যারেলের মত এক সারি কোষ দ্বারা তৈরী, এটি অন্তঃত্বক (Endodermis)।

III. **স্টেলি** (Stele) : এটি মূলের কেন্দ্রীয় অংশ এবং এতে আছে (1) **পেরিসাইকল**—এক সারি প্যারেনকাইমা যা স্টেলির অপর অংশগুলিকে ঘিরে রাখে। (2) **ভ্যাসকুলার বাণ্ডল**—সংখ্যা ছয়-এর বেশী, জাইলেম ও ফ্লোয়েম আলাদা আলাদা গুচ্ছে পাশাপাশি বিন্যস্ত থাকে। (3) স্টেলির কেন্দ্রটি প্যারেনকাইমা দিয়ে তৈরী, এটিকে মজ্জা বা পিথ (Pith) বলে। একবীজপত্রী মূলের মজ্জা দ্বিবীজপত্রী মূলের থেকে বড়।

দ্বিবীজপত্রী ও একবীজপত্রী উদ্ভিদের মূলের কয়েকটি প্রধান পার্থক্য

	দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের মূল	একবীজপত্রী উদ্ভিদের মূল
1.	কর্টেক্স ছোট,	কর্টেক্স বড়।
2.	ভ্যাসকুলার বাণ্ডল-এর সংখ্যা চার থেকে ছয়,	ভ্যাসকুলার বাণ্ডল-এর সংখ্যা ছয়-এর বেশী।
3.	মজ্জা সংক্ষিপ্ত,	মজ্জা বিস্তৃত।

পাতার আভ্যন্তরীণ গঠন

(Internal Structure of a Leaf)

দ্বিবীজপত্রী গাছের একটি কচি পাতা সংগ্রহ কর, তার একটি পাতলা প্রস্থচ্ছেদ নাও। পাতার প্রস্থচ্ছেদ করা শক্ত, তাই আলু অথবা গাজরের একটি টুকরো ব্লেড চালিয়ে দুভাগ করে তার মধ্যে পাতার

একটি টুকরো নিয়ে প্রস্থচ্ছেদ কাটলে সুবিধা হয়। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের তলায় প্রস্থচ্ছেদটি পরীক্ষা করলে নিম্নলিখিত অংশগুলি দেখা যাবে।

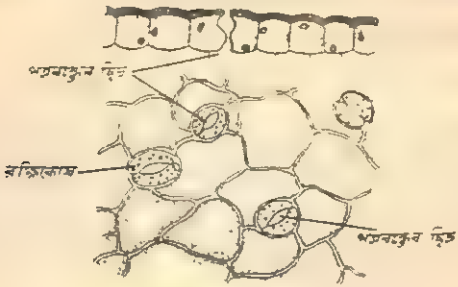

অসংখ্য পত্ররন্ধ্র পাতার বহিঃত্বকে অবস্থিত।

I. **বহিঃত্বক** (Epidermis) : পাতার দুটি বহিঃত্বক আছে, একটি উপর দিকে—উর্ধ্ববহিঃত্বক (Upper Epidermis), আর একটি নীচের দিকে—নিম্নবহিঃত্বক (Lower Epidermis)। দুটি বহিঃত্বকই এক সারি ব্যারেল আকৃতির প্যারেনকাইমা দ্বারা গঠিত এবং দুটি স্তরের ওপরই কিউটিকলের আবরণ আছে। লক্ষ্য কর, এই বহিঃত্বকের মাঝে মাঝে ফাঁকা স্থান আছে, ঐ স্থানগুলিতে পত্ররন্ধ্র বা স্টোমা (Stoma, plural—stomata) আছে, যার মধ্য দিয়ে গ্যাসের আদান-প্রদান ঘটে।

II. **মেসোফিল কলা** (Mesophyll tissue) : দুই ত্বকের মধ্যবর্তী অংশ যে কোষগুলি দিয়ে তৈরী, তাকে মেসোফিল কলা বলে। উর্ধ্ব-বহিঃত্বকের সঙ্গে স্তম্ভাকারে বিন্যস্ত প্যারেনকাইমা স্তরকে প্যালিসেড প্যারেনকাইমা আর তার নীচের ছড়ান প্যারেনকাইমা স্তরগুলিকে বলে স্পঞ্জি প্যারেনকাইমা। এগুলিতে ক্লোরোপ্লাস্ট যথেষ্ট থাকাতে এরা খাদ্য তৈরী করতে সক্ষম। পত্ররন্ধ্র সংলগ্ন গহ্বরটিকে **শ্বাস গহ্বর** বলে (Respiratory cavity)।

III. **ভ্যাসকুলার বাণ্ডল** (Vascular bundle) : পাতার প্রধান শিরার মধ্য দিয়ে ভ্যাসকুলার বাণ্ডল বিস্তৃত হয়েছে, শিরা-উপশিরার সংখ্যা অনুসারে ভ্যাসকুলার বাণ্ডল-এর সংখ্যার তারতম্য ঘটে।

প্রত্যেক বাণ্ডলকে ঘিরে একটি প্যারেনকাইমা স্তরের আচ্ছাদন আছে। এটিকে বাণ্ডল আচ্ছাদন (Bundle sheath) বলে। পাতার ওপর দিকে জাইলেম থাকে, নীচের দিকে ফ্লোয়েম থাকে, এর মধ্যে কোন ক্যামবিয়াম নেই।

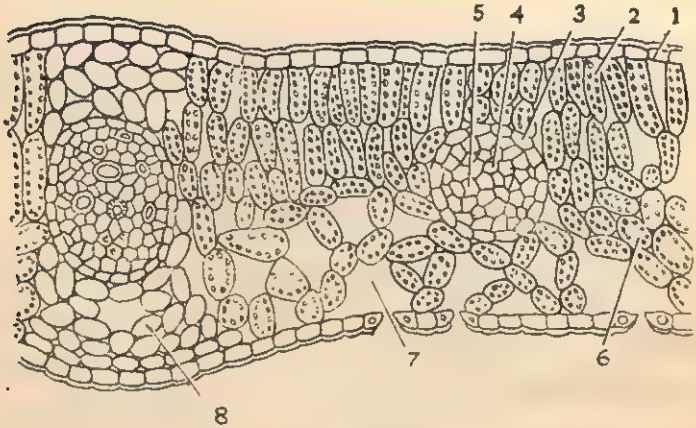

দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের পাতার প্রস্থচ্ছেদ :

1. কিউটিকলসহ বহিঃত্বক 2. প্যালিসেড প্যারেনকাইমা
3. ভ্যাসকুলার বাণ্ডল 4. জাইলেম 5. ফ্লোয়েম
6. স্পঞ্জী প্যারেনকাইমা 7. পত্ররন্ধ্র ও শ্বাসগহ্বর
8. বায়ুগহ্বর।

অনুশীলনী

1. মানুষের দেহের মধ্যে যেমন একটা হাড়ের কংকাল আছে উদ্ভিদের দেহের মধ্যে তেমন কিছু নেই ; তবু বট, নারিকেল প্রভৃতি বিরাট বিরাট বৃক্ষগুলি মাটির ওপর কি করে এবং কিসের সাহায্যে দাঁড়িয়ে থাকে ? বড় বড় বৃক্ষের শাখার প্রান্তগুলি নরম কিন্তু কাণ্ডটি শক্ত মনে হয় কেন ?
2. কলা কাকে বলে ? ভাজক কলা উদ্ভিদের কোন কোন অংশে পাওয়া যায় ছবি এঁকে দেখাও।

3. উদ্ভিদের সরল স্থায়ী কলার বিভিন্ন ভাগগুলি ছবি এঁকে বর্ণনা কর।
4. একটি সূর্যমুখী গাছের কাণ্ডের প্রস্থচ্ছেদের ছবি এঁকে বিভিন্ন অংশগুলির নাম লেখ এবং কোনগুলি সরল কলা এবং কোনগুলি জটিল কলা তা লেবেল করে দেখাও।
5. একটি ভুট্টা গাছের কাণ্ডের প্রস্থচ্ছেদ এঁকে বিভিন্ন অংশের নাম লেখ, সূর্যমুখীর কাণ্ডের সঙ্গে এর পার্থক্যগুলি বর্ণনা কর।
6. একটি দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদমূলের প্রস্থচ্ছেদ এঁকে বিভিন্ন অংশের বর্ণনা কর।
7. একটি পাতার আভ্যন্তরীণ গঠনের ছবি আঁক।
8. টীকা লেখ :

   ক্যামবিয়াম, লিগনিন, কিউটিন, পত্ররন্ধ্র, স্ক্লেরেনকাইমা, জাইলেম, জটিল কলা, কর্টেক্স, স্টেলি, পিথ, কর্ক টিস্যু।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রাণিদেহের কলা ও অঙ্গ

(Animal tissues and organs)

উদ্ভিদের মত প্রাণিদেহও বিভিন্ন রকম কলার সাহায্যে গঠিত। উদ্ভিদের প্রসঙ্গে আমরা জেনেছি, যে-সকল কোষের আকৃতি, উৎপত্তি-স্থান ও কার্যপ্রণালী এক, সেইরকম কোষের সমষ্টিকে **কলা বা টিস্যু** (Tissue) বলে। এই সংজ্ঞা প্রাণিদেহের পক্ষেও প্রযোজ্য। প্রাণি-দেহেও বিভিন্ন কাজ বিভিন্ন কলার সাহায্যে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে এবং একটি নির্দিষ্ট শ্রমবিভাগের রীতি তাদের কাজের মধ্যে দেখা যায়।

প্রাণিদেহে চার রকম কলা আছে ঃ

I. **আবরণী কলা বা এপিথেলিয়াল টিস্যু** (Epithelial tissue)

II. **যোগকলা বা কানেকটিভ টিস্যু** (Connective tissue)

III. **পেশীকলা বা মাসকুলার টিস্যু** (Muscular tissue)

IV. **নার্ভকলা বা নার্ভ টিস্যু** (Nerve tissue)

I. **আবরণী কলা** (Epithelial tissue) ঃ দেহের বাহির ও ভিতরের অঙ্গগুলির একটা আবরণ সৃষ্টি করাই এই কলার কাজ। আমাদের শরীরের ওপরের ত্বক, পাকনালীর ভিতরের পর্দা ইত্যাদি আবরণী কলার উদাহরণ। এই কলার একটি বৈশিষ্ট্য হল এর কোষগুলি পরস্পর ঘনসন্নিবিষ্ট। এই কোষগুলি কখন একটি মাত্র স্তরে (Simple), আবার কখনও বহু স্তরে (Stratified) বিন্যস্ত থাকে। কোষের আকৃতি অনুযায়ী আবরণী কলাকে চার ভাগে ভাগ করা যায়।

1. **কলাম্‌নার এপিথেলিয়াম** (Columnar=স্তম্ভাকৃতি) : এর কোষগুলি স্তম্ভাকার, এই কলার বহির্ভাগে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম খাঁজ আছে, মেরুদণ্ডী প্রাণীর পাকস্থলী ও অন্ত্রের ভিতরের স্তর এই কলা দ্বারা গঠিত।

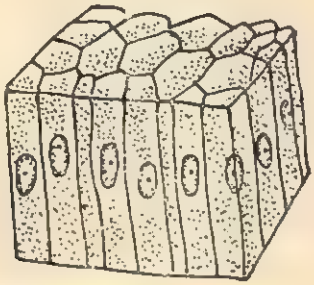

কলামনার এপিথেলিয়াম

2. **স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম** (Squamous=আঁইশাকৃতি) : এই কলার কোষগুলি প্রায় চ্যাপ্টা ও মাছের আঁইশের মত

স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম

সাজান থাকে। হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস প্রভৃতি অঙ্গের বাহিরে এই কলা দেখা যায়। আমাদের দেহত্বক, মুখগহ্বর ও নাসিকাগহ্বরের আবরণী স্তরীভূত স্কোয়ামাস এপিথেলিয়ামে গঠিত।

3. **কিউবিক্যাল এপিথেলিয়াম** (Cubical=ঘনক্ষেত্রাকার) : এই কলার কোষগুলি প্রায় ঘনক্ষেত্রাকার। লালাগ্রন্থি, বৃক্কমলিকা ও থাইরয়েড গ্রন্থির আবরণীতে এই রকম কলা আছে।

কিউবিক্যাল এপিথেলিয়াম

4. **সিলিয়েটেড এপিথেলিয়াম** (Ciliated=রোমশ) : এই কলার কোষগুলি স্তম্ভাকার কিংবা ঘনক্ষেত্রাকার। এই কোষগুলির বহির্ভাগে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সিলিয়া (Cilia) বা রোম আছে। এই কলা শ্বাসনালীর আবরণীতে আছে।

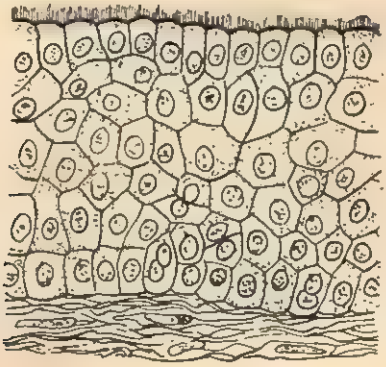

সিলিয়েটেড এপিথেলিয়াম

II. **যোগকলা বা কানেকটিভ টিস্যু** (Connective tissue) : আবরণী কলার মত এই কলার কোষগুলি ঘনসন্নিবিষ্ট নয়। এই কলায় কোষের সংখ্যা কম, কিন্তু প্রতি দুইটি কোষের মধ্যবর্তী স্থানে অন্তঃ-কোষ পদার্থের পরিমাণ বেশী। এই কলা যেমন একটি অঙ্গকে আর একটি অঙ্গের সঙ্গে যুক্ত করে রাখে, তেমনি একই অঙ্গের বিভিন্ন

অংশকেও পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত করে রাখে। এই কলা দেহের ভার বহনের কাজও করে। প্রকৃতি অনুসারে যোগকলাকে প্রধান তিন

তন্তুময় যোগকলা

ভাগে ভাগ করা যায়ঃ (1) **তন্তুময় যোগকলা,** (2) **মেদকলা,** (3) **বিশিষ্ট যোগকলা**। বিশিষ্ট যোগকলা আবার তিন প্রকারের ঃ (a) **কোমলাস্থি,** (b) **অস্থি,** (c) **রক্ত**।

1. **তন্তুময় যোগকলা** (Fibrous connective tissue) ঃ মেরুদণ্ডী প্রাণীদের দেহত্বকের নীচে বা অন্ত্রের প্রাচীরের ভিতর এই কলা দেখা যায়। এই কলায় কোষের সংখ্যা কম এবং কোষগুলির সঙ্গে একক বা গুচ্ছবদ্ধভাবে তন্তু দেখতে পাওয়া যায়। লিগামেণ্ট ও টেনডন তন্তুময় কলা দিয়েই তৈরী।

2. **মেদকলা** (Adipose connective tissue) ঃ এই কলার কোষগুলি বেশ বড় এবং কোষের বেশীর ভাগ জায়গা জুড়ে চর্বিকণা ভর্তি থাকে। আমাদের ঘাড় ও পেটের চামড়ার নীচে এই কলা বেশী থাকে।

3. **বিশিষ্ট যোগকলা** ঃ

(a) **কোমলাস্থি** (Cartilage) ঃ এই কলা অপেক্ষাকৃত কঠিন কিন্তু নমনীয়, তাই আঘাতে বা চাপে ভাঙ্গে না। স্তন্যপায়ী প্রাণীদের কানের পাতায় এই কলা থাকে। পাঁজরের হাড়ের প্রান্তে ও শ্বাস-

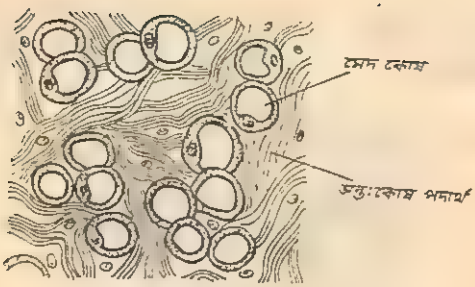

মেদকলা

নালীতেও এই কলা থাকে। এই কলার কোষগুলি গুচ্ছে গুচ্ছে কনড্রিন (Condrin) নামে এক প্রকার অন্তঃকোষীয় জৈব পদার্থের মধ্যে ছড়িয়ে থাকে। কোমলাস্থিকে ঘিরে একটা তন্তুময় পর্দা থাকে।

অস্থিকলার লম্বচ্ছেদে হ্যাভারসিয়ান নালীর অবস্থান দেখান হয়েছে

অস্থিকলার প্রস্থচ্ছেদে অস্থিকোষ ও হ্যাভারসিয়ান নালীর অবস্থান দেখান হয়েছে

(b) অস্থি (Bone) : এই কলার অন্তঃকোষ পদার্থ অত্যন্ত কঠিন, তা প্রধানতঃ ক্যালসিয়াম ফসফেট দ্বারা তৈরী। তাই অস্থি যথেষ্ট আঘাত ও চাপ সহ্য করতে পারে। অস্থিই আমাদের দেহের ভার বহন করে থাকে। অস্থির মধ্যস্থিত গহ্বর অস্থিমজ্জায় পূর্ণ অস্থিকোষগুলি দেখতে মাকড়সার মত এবং এর মধ্যস্থলে একটি রন্ধ্র (Haversian canal—হ্যাভারসিয়ান ক্যানাল) থাকে এবং তা সরু সরু নালীর সাহায্যে অস্থিমজ্জার সঙ্গে সংযুক্ত। অস্থির বহির্ভাগ একটি পাতলা পর্দাদ্বারা আবৃত থাকে। লাল অস্থিমজ্জা রক্তের লোহিত কণিকা তৈরীতে সাহায্য করে।

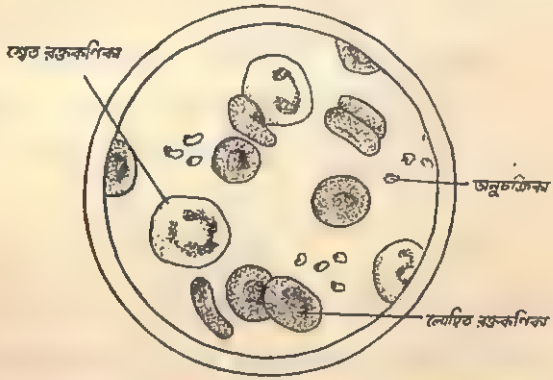

লোহিত রক্তকণিকা, শ্বেত রক্তকণিকা ও অণুচক্রিকা

(c) রক্ত (Blood) : আমাদের রক্তও একটি যোগকলা। অন্যান্য যোগকলার সঙ্গে এর তফাত এই যে এর অন্তঃকোষ পদার্থ তরল,—যার নাম রক্তরস বা প্লাজমা (Plasma)। তরল প্লাজমার মধ্যেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য রক্তকণিকা থাকে এবং বিশেষ নালীপথে সারা দেহে চলাচল করে। রক্তকণিকাগুলি এক-একটি স্বতন্ত্র জীবকোষ ছাড়া আর কিছু নয়। রক্তকণিকা প্রধানতঃ দুই প্রকার, লোহিত কণিকা ও শ্বেত কণিকা। এই দুই প্রকার রক্তকণিকা ছাড়াও আরও এক প্রকার ক্ষুদ্রাকার কণিকা রক্তে বর্তমান, তাকে অণুচক্রিকা

বলে। লোহিত কণিকায় হিমোগ্লোবিন নামে এক প্রকার লৌহঘটিত পদার্থ থাকায় লোহিত কণিকাগুলিকে লাল দেখায়, সেইজন্য রক্তের রং লাল। আমাদের রক্তে লোহিত কণিকার সংখ্যা বেশী, শতকরা 99 ভাগ। শ্বেত কণিকার সংখ্যা সাধারণতঃ শতকরা 0·12 ভাগ মাত্র। প্রতি ঘন মিলিমিটার রক্তে লোহিত কণিকা থাকে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ, সেখানে শ্বেত কণিকার সংখ্যা মাত্র ছয় থেকে দশ হাজার।

III. পেশীকলা বা মাসকুলার টিস্যু (Muscular tissue) : এই কলা সংকোচনশীল ও স্থিতিস্থাপক (Elastic), অর্থাৎ রবারের মত টানলে বাড়ে এবং ছেড়ে দিলে আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে। পেশীকলার সঙ্কোচন ও প্রসারণের ফলেই আমরা হাত-পা নাড়তে পারি। মৃত্যুর পর পেশীর এই স্থিতিস্থাপকতা নষ্ট হয়ে যায়, তার ফলে হাত-পা শক্ত হয়ে যায়, সহজে নাড়ান যায় না। মৃত্যুর পর পেশীর এই পরিবর্তনকে **মরণ-সঙ্কোচ বা রিগার মরটিস্** (Rigor mortis) বলে। দেহের বেশীর ভাগ অংশ পেশীকলার সাহায্যেই গঠিত। পুরুষের দেহের ওজনের শতকরা প্রায় 42 অংশ এবং নারী-দেহের শতকরা 36 অংশ পেশীকলার দ্বারা গঠিত, তাই একই ওজনের পুরুষ ও নারীর মধ্যে পুরুষই বেশী শক্তিশালী হয়। সাধারণতঃ তিন রকম পেশীকলা দেখা যায়।

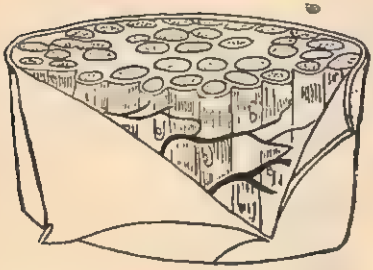

পেশীকলা

1. **ঐচ্ছিক পেশী** (Voluntary muscle) : হাত, পা প্রভৃতির অস্থির সঙ্গে সংযুক্ত পেশীগুলি আমাদের ইচ্ছাধীন, কারণ নার্ভের সাহায্যে আমরা এই পেশীগুলির সঙ্কোচন ও প্রসারণ করতে পারি, তার ফলে আমরা ইচ্ছামত চলাফেরা, ওঠাবসা করতে পারি। ঐচ্ছিক পেশীর প্রতিটি তন্তুতে (Fibre) অনেকগুলি নিউক্লিয়স থাকে এবং

তন্তুগুলি একটি পাতলা আচ্ছাদনে আবৃত। ঐচ্ছিক পেশীগুলির গায়ে প্রস্থের দিকে সাদা-কালো ডোরা ডোরা দাগ দেখা যায়, অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে তা দেখা যায়। সেইজন্য এই পেশীকে সরেখ, বা চিহ্নিত পেশীও (Striped or Straited muscle) বলে।

ক খ গ

(ক) অনৈচ্ছিক পেশী বা অচিহ্নিত পেশী
(খ) ঐচ্ছিক পেশী বা চিহ্নিত পেশী
(গ) হৃৎপিণ্ডের পেশী

2. **অনৈচ্ছিক পেশী** (Involuntary muscle) ঃ আমাদের খাদ্য-নালী, রক্তবাহ নালীগুলি, মূত্রাশয় প্রভৃতি আভ্যন্তরীণ অঙ্গের পেশীর সঙ্কোচন ও প্রসারণ আমাদের ইচ্ছাধীন নয়। সেইজন্য এদের অনৈচ্ছিক পেশী (Involuntary muscle) বলে। এই পেশীর কোষ বা তন্তু-গুলি মাকুর মত দেখতে, মাঝখানে একটি মাত্র নিউক্লিয়স থাকে এবং কোন আচ্ছাদন থাকে না। ঐচ্ছিক পেশীর মত এগুলিতে সাদা-কালো ডোরা দাগ দেখা যায় না, তাই এদের রেখাবিহীন পেশী বা অচিহ্নিত পেশী (Unstriped or unstriated muscle) বলে। অনেক সময় একে মসৃণ পেশীও (Plain or smooth muscle) বলা হয়। নিদ্রাকালে বা জাগ্রত অবস্থায় আমাদের ইচ্ছার ওপর নির্ভর না করেই এই অনৈচ্ছিক পেশীগুলি ধীরে ধীরে সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হয়, তার ফলেই এদের কাজ সুষ্ঠুভাবে চলে।

3. হৃৎপিণ্ডের পেশী (Cardiac muscle) : মেরুদণ্ডী প্রাণীর হৃৎপিণ্ডে এই ধরনের পেশী দেখা যায়। ঐচ্ছিক পেশীর মত এগুলি সরেখ বা রেখাঙ্কিত, কিন্তু কোষের মধ্যে একটি মাত্র নিউক্লিয়স থাকে, এবং পেশীতন্তুর ওপর কোন আচ্ছাদন থাকে না। এগুলি পরস্পর যুক্ত হয়ে একটি জালের মত দেখায়। প্রাণী যতদিন জীবিত থাকে ততদিন অনৈচ্ছিক পেশীর মত এই পেশী অবিরাম সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হয়ে থাকে।

IV. **নার্ভকলা** (Nervous tissue) : নার্ভকলা অসংখ্য নিউরন (Neurone) বা নার্ভকোষ দ্বারা গঠিত। নিউরনের আকার অনেকটা লেজওয়ালা ঘুড়ির মত। প্রত্যেকটি নিউরনের প্রধান অংশ হল কোষদেহ; কোষদেহের মধ্যে নিউক্লিয়স থাকে, নিউক্লিয়সকে ঘিরে থাকে সাইটোপ্লাজম। কোষদেহ থেকে একটি লম্বা শাখা বেরিয়ে এসেছে, তাকে বলে অ্যাক্সন (Axon)। এছাড়া নিউরনের অনেকগুলি ছোট ছোট শাখা থাকে, তাদের নাম ডেনড্রন (Dendron)। অ্যাক্সনগুলিই শেষে নার্ভতন্তুতে পরিণত হয়। নার্ভতন্তুর বাইরে একটা পাতলা আবরণী থাকে, তাকে নিউরোলেমা (Neurolemma) বলে। অনেকগুলি নার্ভতন্তু যোগকলার আবরণে আচ্ছাদিত হয়ে দড়ির মত নার্ভের (Nerve) সৃষ্টি করে থাকে। ডেনড্রনগুলির কাজ হল কোষদেহের মধ্যে অনুভূতি বহন করে নিয়ে যাওয়া আর অ্যাক্সনের কাজ হল তার নির্দেশ বহন

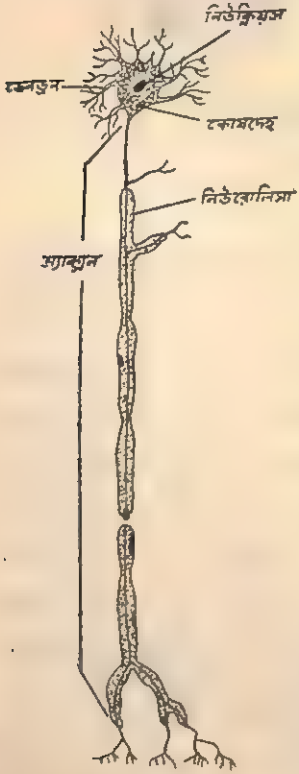

নিউরন

করে পেশীতে নিয়ে যাওয়া। অ্যাক্সনের তন্তুগুলি পেশীর সঙ্গে যুক্ত থাকে এবং ঐ নির্দেশ অনুযায়ী পেশীগুলি সঙ্কুচিত বা প্রসারিত হয় এবং তার ফলে নানা রকম কার্য নিষ্পন্ন হয়।

কতকগুলি কলা বা টিস্যু (Tissue) সম্মিলিতভাবে গঠন করে একটি দেহযন্ত্র বা অঙ্গ (Organ)। যেমন আমাদের ফুসফুস একটি অঙ্গ; এটি আবরণীকলা, নার্ভকলা, যোগকলা, পেশীকলার সমন্বয়ে তৈরী। তেমনি কতকগুলি অঙ্গ সম্মিলিতভাবে গঠন করে একটি তন্ত্র (System), যেমন শ্বসনতন্ত্র (Respiratory system)। এটি আমাদের ফুসফুস, নাসারন্ধ্র ও শ্বাসনালী প্রভৃতি অঙ্গ নিয়ে গঠিত। নীচে প্রাণিদেহের নয়টি তন্ত্রের নাম ও কার্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল।

1. **অস্থি তন্ত্র** (Skeletal system or Osseous system) :—যে তন্ত্র দেহের কাঠামো গঠন করে, দেহের ভার বহন করে, তাকে অস্থিতন্ত্র বলে। অস্থি, কোমলাস্থি বা কার্টিলেজ (Cartilage) ও নানা শক্ত আবরণ নিয়ে অস্থিতন্ত্র গঠিত। শামুক, ঝিনুক ও নানা রকম পতঙ্গের দেহের বাহিরের আবরণটি শক্ত, এদের বলে বহিঃকঙ্কাল (Exoskeletal) প্রাণী। মেরুদণ্ডী প্রাণীর কিন্তু দেহের ভেতরেই কঙ্কালটা থাকে, তাদের তাই বলা হয় অন্তঃকঙ্কাল (Endoskeletal) প্রাণী।

2. **পেশী তন্ত্র** (Muscular system) :—এই তন্ত্রের প্রধান উপাদান পেশী। পেশীকলা আলোচনার সময় ঐচ্ছিক, অনৈচ্ছিক ও হৃৎপিণ্ডের পেশীর কথা আলোচনা করা হয়েছে। বিভিন্ন অঙ্গের নড়াচড়া ও স্থানান্তরে গমনাগমন এই পেশীতন্ত্রের ওপর নির্ভরশীল। আমাদের দেহে অনেক পেশী আছে। আগেই বলা হয়েছে, পুরুষের দেহের ওজনের শতকরা প্রায় 42 অংশই পেশী; নারীদেহের শতকরা 36 অংশ পেশী। তাই একই ওজনের পুরুষ ও নারীর মধ্যে পুরুষই বেশী শক্তিশালী হয়। পুরুষদের মধ্যে সকলের পেশীর সংখ্যা প্রায় সমান, তবুও কেউ বেশী শক্তিশালী, কেউ কম শক্তিশালী

হয় কেন? নানা রকম কাজকর্ম ও নিয়মিত ব্যায়ামের ফলে পেশীগুলি পুষ্ট হয়; তাদের কাজ করবার শক্তি বাড়ে; মানুষও সেই অনুপাতে শক্তিশালী হয়।

3. **পৌষ্টিক তন্ত্র বা পাচন তন্ত্র** (Alimentary system or Digestive system): খাদ্যগ্রহণ, পরিপাক, সেইসঙ্গে জীর্ণ খাদ্য-কণার শোষণ ও অপাচ্য অংশের বহিষ্করণ এই তন্ত্রের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। মুখ থেকে আরম্ভ করে পায়ু পর্যন্ত খাদ্যনালীর বিভিন্ন অংশ, যেমন—শ্বাসনালী, পাকস্থলী, অন্ত্র, তা ছাড়া যকৃৎ, অগ্ন্যাশয় প্রভৃতিও পৌষ্টিক তন্ত্রের বিভিন্ন অংশ।

4. **সংবহন তন্ত্র** (Circulatory system): হৃদ্‌যন্ত্র ও রক্তবাহ নালী নিয়ে এই তন্ত্র গঠিত। এই তন্ত্রের সাহায্যে দেহের সর্বত্র রক্ত সঞ্চালিত হয়। হৃদ্‌যন্ত্র একটি পাম্পের মত দিবারাত্র কাজ করে। রক্তের মাধ্যমে দেহের প্রতিটি জীবকোষে অক্সিজেন সরবরাহ হয় ও দূষিত পদার্থ পরিত্যক্ত হয়। রক্তই জীর্ণ খাদ্য বস্তু ও হরমোন নামক উত্তেজক রস বিভিন্ন অংশে পৌঁছে দিয়ে দেহের বিপাক ও পুষ্টি সাধনে সাহায্য করে।

5. **শ্বসন তন্ত্র** (Respiratory system): এই তন্ত্রের সাহায্যে অক্সিজেন গ্রহণ ও দেহের ভেতর থেকে দূষিত কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস বের করে দেওয়া হয়ে থাকে। আমাদের শ্বসন তন্ত্র প্রধানতঃ ফুসফুস, নাসারন্ধ্র ও শ্বাসনালী নিয়ে গঠিত। মাছেদের শ্বাসযন্ত্র হল ফুলকা। কীট-পতঙ্গের বেলায় শ্বাসনালীই তাদের বিশেষ শ্বাসযন্ত্র।

6. **রেচন তন্ত্র** (Excretory system): এই তন্ত্রের মাধ্যমে দূষিত বর্জ্য পদার্থ দেহ হতে বের হয়ে আসে। মেরুদণ্ডী প্রাণীর ক্ষেত্রে বৃক্ক, মূত্রস্থলী ও পতঙ্গাদির ক্ষেত্রে ম্যাল্‌পিজিয়ান নালী (Malpighi-an tubules) ইত্যাদি এর প্রধান অঙ্গ।

7. **নার্ভ তন্ত্র** (Nervous system): মস্তিষ্ক, সুষুম্নাকাণ্ড ও বিবিধ নার্ভের সাহায্যে এই তন্ত্র গঠিত। এ ছাড়া চোখ, কান, নাক

প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয়কেও এই তন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বাইরের উত্তেজনায় সাড়া দেওয়া, দেহের বিভিন্ন তন্ত্রের ক্রিয়াকলাপের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা, মানুষের ক্ষেত্রে চিন্তা করা এর প্রধান কার্য।

8. **অন্তর্নিস্রাবী গ্রন্থি তন্ত্র বা এণ্ডোক্রিন তন্ত্র** (Endocrine system) : প্রাণিদেহে কতকগুলি নালীবিহীন গ্রন্থি আছে, তাদের এণ্ডোক্রিন গ্ল্যাণ্ড বলে, এই গ্রন্থি থেকে হরমোন বা উত্তেজক রস নির্গত হয়। এই হরমোন বৃদ্ধি ও নানা বিপাকক্রিয়ায় সাহায্য করে এবং নার্ভ তন্ত্রের সহায়তায় প্রাণিদেহের বিভিন্ন তন্ত্রগুলি যাতে মিলে-মিশে পরস্পরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কাজ করে সে বিষয়ে সাহায্য করে।

9. **জনন তন্ত্র** (Reproductive system) : যে তন্ত্রের সাহায্যে প্রাণী বংশবিস্তারে সমর্থ হয় তাকে জনন তন্ত্র বলে। এই তন্ত্রের প্রধান অঙ্গ হল শুক্রাশয়, ডিম্বাশয় ও তৎসংক্রান্ত নালী।

অনুশীলনী

1. কলা কাকে বলে? প্রাণিদেহে কত রকম কলা দেখতে পাওয়া যায়? চিত্রসহ একটি করে উদাহরণ দাও।
2. আবরণী কলার কাজ কি? চিত্রসহ বিভিন্ন প্রকার আবরণী কলার বিবরণ দাও।
3. যোগকলা বলতে কি বোঝ? বিভিন্ন প্রকার যোগকলার ছবি আঁক ও তাদের বিভিন্ন অংশ লেবেল কর।
4. একটি নিউরনের ছবি আঁক ও বিভিন্ন অংশ লেবেল কর।
5. অঙ্গ ও তন্ত্র বলতে কি বোঝ? উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও।
6. টীকা লেখ : কোমলাস্থি, অস্থি, রক্ত, ঐচ্ছিক পেশী, অনৈচ্ছিক পেশী, অ্যাক্সন, ডেনড্রন, নার্ভ, সংবহন তন্ত্র, পৌষ্টিক তন্ত্র।

চতুর্থ অধ্যায়

কয়েকটি প্রাণীর বিভিন্ন তন্ত্র ও তার কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

(Outline idea of different systems with functions)

অমেরুদণ্ডী ঃ আরশোলা

(Invertebrate Cockroach)

আরশোলা মেরুদণ্ডহীন প্রাণী। এটি একটি ডানাযুক্ত, সন্ধিপদ প্রাণী—পতঙ্গ (Insect)। আরশোলার দেহের বিভিন্ন তন্ত্র ও তার কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নীচে দেওয়া হল।

1. **কঙ্কাল তন্ত্র ঃ** পতঙ্গ মাত্রই বহিঃকঙ্কাল প্রাণী, অর্থাৎ তার দেহের ওপরে একটি খোলস বা আবরণী (Cuticle) থাকে, তার দেহের মধ্যে কোন কঙ্কাল থাকে না। আরশোলার দেহও মেহগিনী রং-এর শক্ত একটি খোলস বা আবরণীতে ঢাকা, দেহের ভেতরের তন্ত্রগুলিকে রক্ষা করা ও বিভিন্ন পেশীকে ধরে রাখাই এর প্রধান কাজ।

2. **পৌষ্টিক তন্ত্র ঃ** আরশোলার পৌষ্টিক তন্ত্র ঃ (ক) **পৌষ্টিক নালী** ও (খ) **লালাযন্ত্র** নিয়ে গঠিত।

(ক) **পৌষ্টিক নালী ঃ**—পৌষ্টিক নালী মুখছিদ্র হতে সুরু করে পায়ুতে শেষ হয়েছে, এটি নিম্নলিখিত অংশ নিয়ে গঠিত।

(1) **মুখছিদ্র ঃ** মুখছিদ্র কতকগুলি উপাঙ্গ দ্বারা বেষ্টিত, যেমন—এক জোড়া চোয়াল (ম্যানডিবল), উপরোষ্ঠ (লেব্রাম), নিম্নোষ্ঠ (লেবিয়াম), একটি মাংসল জিহ্বা (হাইপোফ্যারিংস্)। এই উপাঙ্গগুলিই খাদ্যবস্তু গ্রহণে সহায়তা করে এবং আংশিকভাবে খাদ্য পেষণে সাহায্য করে।

(2) **মুখবিবর** ঃ মুখছিদ্রের পরের অংশকে **মুখবিবর** বলে।

(3) **গলবিল** ঃ মুখবিবরের পরে পৌষ্টিক নালীর সরু অংশকে **গলবিল** বলে।

গ্রাসনালী ঃ গলবিলের পরের অংশ হল **গ্রাসনালী**।

(5) **ক্রপ** ঃ গ্রাসনালীর পরের অংশ চওড়া হয়ে পাতলা প্রাকারবিশিষ্ট থলিতে পরিণত হয়েছে, একে **ক্রপ** বলে। এখানে খাদ্যবস্তু সাময়িকভাবে জমা থাকে।

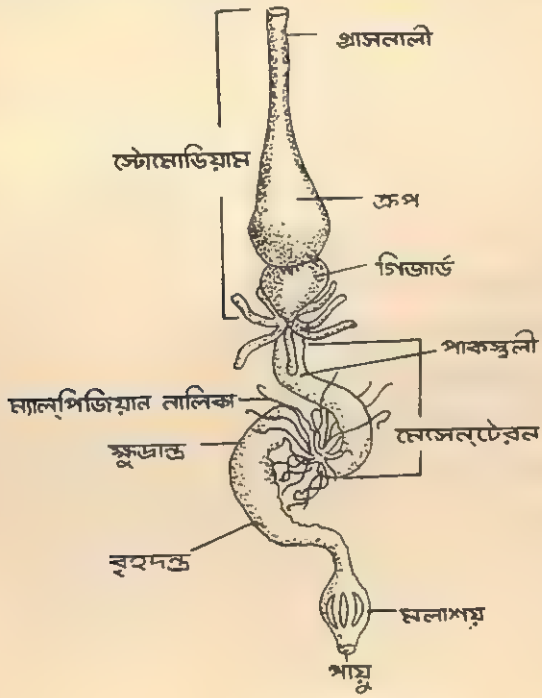

আরশোলার পৌষ্টিক নালী

(6) **গিজার্ড** ঃ ক্রপের পরের পেশীবহুল অংশকে **গিজার্ড** বলে। গিজার্ডের অন্তঃপ্রাকার শক্ত আবরণীতে ঢাকা এবং এই শক্ত আবরণী ছয়টি ভাঁজের সৃষ্টি করেছে, এগুলিকে গিজার্ডের দাঁত বলে। আমরা মুখের মধ্যে যেমন খাদ্য বস্তু চর্বণ করি, আরশোলারা তেমনি গিজার্ডের

মধ্যে এই শক্ত পেশীর সাহায্যে খাদ্যবস্তু পিষ্ট করে অর্ধ তরল অবস্থায় পরিণত করে।

(7) **মেসেনটেরন** ঃ গিজার্ডের পর পৌষ্টিক নালীর সরু অংশকে **মেসেনটেরন** বলে। মেসেনটেরনের অগ্রভাগে 7-8টি সরু নলের মত অংশ দেখা যায়, এদের **হেপাটিক সিকা** বলে। পৌষ্টিক নালীর এই অংশে খাদ্য আংশিকভাবে পরিপাক ও শোষিত হয়। মেসেনটেরনের মাঝখানে অনেকগুলি সূক্ষ্ম হাল্কা হলুদ রঙের নালিকা আছে, এগুলিকে **ম্যালপিজিয়ান নালিক** বলে। এগুলি আরশোলার রেচন অঙ্গ হিসাবে পরিচিত।

(8) **কোলন** বা **বৃহদন্ত্র** ঃ মেসেনটেরনের পরেই কোলন, এখানে জল ও কিছু খাদ্য শোষিত হয়।

(9) **মলাশয়** ঃ পৌষ্টিক নালীর শেষ অংশই হল **মলাশয়**। এখানে জল শোষিত হয় ও অপাচ্য খাদ্য মলরূপে সঞ্চিত থাকে।

(10) **পায়ু** ঃ পৌষ্টিক নালী শেষ হয়েছে পায়ুছিদ্রতে। মলাশয় হতে মল নির্গত হয় এই ছিদ্রের মধ্য দিয়ে।

(খ) **লালাযন্ত্র** ঃ গ্রাসনালী ও ক্রপের দুই দিকে **লালাযন্ত্র** আছে। এটি লালাগ্রন্থি ও লালাধার নিয়ে গঠিত। লালাগ্রন্থি থেকে নিঃসৃত লালা প্রথমে লালাধারে জমা হয়, তারপর নালীপথে মুখবিবরে এসে খাদ্যের সঙ্গে মেশে ও খাদ্য পরিপাক ও সিক্ত করার কাজে লাগে। **হেপাটিক সিকার** কথা আগেই বলা হয়েছে। এই নালীগুলি থেকে নিঃসৃত রস মেসেনটেরনে এসে খাদ্যের সঙ্গে মিশে খাদ্য পরিপাকে সহায়তা করে।

3. **শ্বসন তন্ত্র** ঃ আরশোলারা অন্যান্য পতঙ্গদের মতই বাতাস থেকে অক্সিজেন নিয়ে শ্বাসকার্য চালায়। এজন্য এদের দেহের মধ্যে দশ জোড়া শ্বাসছিদ্র ও শাখা-প্রশাখাযুক্ত শ্বাসনালী আছে। শ্বসনের সময় আরশোলার দেহ নিয়মিতভাবে একবার সঙ্কুচিত তারপর আবার প্রসারিত হয়, তার ফলে বাইরের বাতাস শ্বাসছিদ্রের পথে দেহের মধ্যে

প্রবেশ করে। প্রত্যেকটি শ্বাসছিদ্রের সঙ্গে এক বা একাধিক শ্বাসনালী যুক্ত আছে। এই শ্বাসনালীগুলি ক্রমাগত শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে দেহের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে এবং নালীর সূক্ষ্ম অংশগুলি দেহকোষের সঙ্গে যুক্ত আছে। তার ফলে দেহের প্রতিটি কোষই ঐ বাতাস থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং কোষ থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড দেহের বাইরে বার করে দেয়। গ্যাসের এই আদান-প্রদানে আরশোলার রক্ত কোন অংশ গ্রহণ করে না।

আরশোলার শ্বসন তন্ত্র

4. রক্ত-সংবহন তন্ত্রঃ আরশোলার রক্ত-সংবহন তন্ত্র আদৌ জটিল ও উন্নত নয়। এই তন্ত্র রক্ত, হৃৎপিণ্ড ও মহাধমনী (অ্যাওর্টা) ও অসংখ্য দেহগহ্বর নিয়ে গঠিত। আরশোলার রক্ত জলের মত বর্ণহীন, কারণ এতে হিমোগ্লোবিন থাকে না। আরশোলার রক্ত রক্তরস (প্লাজমা) ও শ্বেতকণিকা (হিমোসাইট) নিয়ে গঠিত। খাদ্য ও বর্জ্য পদার্থ বহন করে নিয়ে যাওয়াই আরশোলার রক্তের মুখ্য কাজ। আরশোলার রক্তকে হিমোলিম্ফ বলে।

আরশোলার রক্ত-সংবহন তন্ত্র অন্যান্য পতঙ্গদের রক্ত সংবহন-তন্ত্রের মতই মুক্ত (Open System)। রক্তনালীর মধ্য দিয়ে কিছু দূর প্রবাহিত হবার পর আরশোলার রক্ত শাখায়-প্রশাখায় বিভক্ত দেহগহ্বরের মধ্য দিয়ে, দেহের নানা কোষ ও কলার (Tissue) মাঝ দিয়ে মুক্ত অবস্থায় প্রবাহিত হতে থাকে; এই ধরনের ব্যবস্থাকে মুক্ত সংবহন তন্ত্র (Open Circulation System) বলে।

আরশোলার হৃৎপিণ্ডটি লম্বা নলের আকারে তেরটি ফানেলের মত প্রকোষ্ঠের সাহায্যে গঠিত। দুইটি প্রকোষ্ঠের সংযোগস্থলে একটি করে কপাটিকা বা ভালভ্ আছে, এবং প্রতি প্রকোষ্ঠে এক জোড়া করে ছিদ্র আছে। এই ছিদ্রগুলিতেও কপাটিকা বা ভালভ্ আছে, তার

ফলে রক্ত একটি বৃত্তাকার পথে কেবল একই দিকে প্রবাহিত হতে পারে। হৃৎপিণ্ডের দুই পাশের পেশীগুলিকে অ্যালারি পেশী বলে, এই পেশীগুলির সাহায্যে হৃৎপিণ্ডটি বার বার সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হয়ে থাকে এবং তার ফলে রক্ত হৃৎপিণ্ড থেকে হৃৎপিণ্ডের সম্মুখে অবস্থিত মহাধমনীর মধ্যে প্রবেশ করে; তারপর ঐ রক্ত অসংখ্য শাখায়-প্রশাখায় বিভক্ত দেহগহ্বরের মধ্য দিয়ে মস্তক ও দেহের অন্যান্য অংশে প্রবাহিত হয় এবং পরিশেষে হৃৎপিণ্ডের পার্শ্বদেশের তের জোড়া ছিদ্র দিয়ে আবার হৃৎপিণ্ডের মধ্যে ফিরে আসে। এইভাবে একটি বৃত্তাকার পথে আরশোলার রক্ত প্রবাহিত হয়ে থাকে।

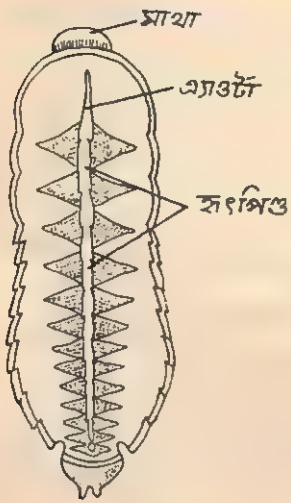

আরশোলার হৃদ্‌যন্ত্রও মহাধমনী (অ্যাওর্টা)

5. **রেচন তন্ত্রঃ** আরশোলার রেচনতন্ত্রের প্রধান অঙ্গ হল **ম্যালপিজিয়ান নালিকা**। আরশোলার পৌষ্টিক তন্ত্র আলোচনার সময় আমরা জেনেছি পৌষ্টিক নালীর মেসেনটেরনের অংশ থেকে অনেকগুলি সূক্ষ্ম হাল্কা হলুদ রঙের নালিকা বের হয়েছে, এগুলিকে ম্যালপিজিয়ান নালিকা বলে এই নালিগুলির শেষ প্রান্ত বন্ধ। এই নালিকাগুলির প্রাকার খুব পাতলা, দেহরস থেকে বর্জ্য পদার্থ সংগ্রহ করে অন্ত্রে নিক্ষেপ করাই এর প্রধান কাজ। **এই সংগৃহীত রস থেকে** জলীয় অংশ পুনরায় শোষিত হয় এবং প্রায় শুষ্ক বর্জ্য পদার্থ অন্ত্র থেকে পায়ুপথের মাধ্যমে দেহের বাইরে নিক্ষিপ্ত হয়। আরশোলারা নাইট্রোজেন-ঘটিত পদার্থ **ইউরিক অ্যাসিড** বর্জ্য পদার্থরূপে ত্যাগ করে থাকে। অনেক সময় তারা শুষ্ক ইউরিক অ্যাসিড কৃস্টাল বর্জ্য

পদার্থরূপে ত্যাগ করে, এজন্য দেহ থেকে খুব কম জলই তাদের ত্যাগ করতে হয়। আরশোলারা অতি অল্প জলে কাজ চালিয়ে নিয়ে তাই বেঁচে থাকতে সক্ষম হয়।

6. **নার্ভ তন্ত্র ঃ** আরশোলার নার্ভ তন্ত্র প্রধানতঃ **মস্তিষ্ক ও অঙ্কীয় নার্ভসূত্র** নিয়ে তৈরী। আরশোলার মাথার মধ্যে বড় আকারের এক জোড়া নার্ভগ্রন্থিই হল আরশোলার মস্তিষ্ক। মস্তিষ্কের দুপাশ থেকে দুটি মোটা নার্ভসূত্র বের হয়ে বক্ষ ও উদরের দিকে চলে গেছে; এই দুটিকে **অঙ্কীয় নার্ভসূত্র** বা **ভেণ্ট াল নার্ভ কর্ড** বলে। আরশোলার দুটি চোখ (পুঞ্জাক্ষি) আছে। অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দর্শন-যন্ত্র নিয়ে এই চোখ দুটি তৈরী, এই-জন্য এদের বলা হয় **পুঞ্জাক্ষি** (Compound eye)। পতঙ্গদের এটা বৈশিষ্ট্য। পুঞ্জাক্ষি দুটি বৃন্তহীন। আরশোলার দুটি শুঙ্গ ঘ্রাণেন্দ্রিয় ও স্পর্শেন্দ্রিয়ের কাজ করে। স্পর্শ অনুভূতি প্রধানতঃ শুঙ্গ দিয়ে গ্রহণ করলেও সমস্ত দেহ দিয়েই আরশোলারা তা গ্রহণ করতে পারে। আরশোলাদের কোন শ্রবণেন্দ্রিয় নেই, আরশোলারা তাই কোন শব্দ শুনতে পায় না। বাইরে যতই গোলমাল হোক না কেন, আরশোলারা পরম শান্তিতে বাস করতে পারে।

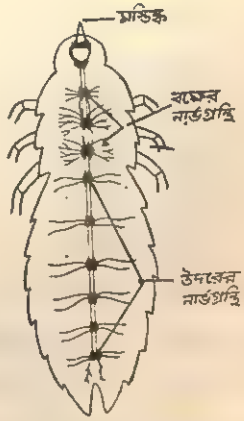

আরশোলার নার্ভ তন্ত্র

7. **জনন তন্ত্র ঃ** আরশোলারা একলিঙ্গ প্রাণী, অর্থাৎ স্ত্রী ও পুরুষ দুই ধরনের আরশোলা আছে। পুরুষ আরশোলার দেহে পুংজনন তন্ত্র এবং স্ত্রী আরশোলার দেহে স্ত্রীজনন তন্ত্র আছে। স্ত্রী ও পুরুষ আর-শোলাদের সহজেই আলাদা করে চেনা যায়। পুরুষ আরশোলার

দেহের পশ্চাদ্‌ভাগে এক জোড়া অতিরিক্ত শলাকা (Style) আছে এবং স্ত্রী আরশোলার উদর পুরুষ আরশোলার থেকে বেশী চওড়া হয়।

পুরুষ আরশোলার পুংজনন তন্ত্র (1) শুক্রাশয় (২) শুক্রনালী (3) শুক্রথলি, (4) ক্ষেপণনালী, (5) জননথলি, (6) পুংজনন ছিদ্র ও (7) কনগ্লোবেট গ্রন্থি নিয়ে গঠিত।

পুরুষ আরশোলার দেহে দুটি শুক্রাশয় আছে, শুক্রাশয়ে শুক্রাণু তৈরী হয়। ঐ শুক্রাণুগুলি দুটি শুক্রনালীপথে নেমে এসে দুটি শুক্রথলিতে সাময়িকভাবে জমা হয়। এ দুটি থলি পরস্পর কাছাকাছি অবস্থিত এবং অনেকটা ব্যাঙের ছাতার মত দেখতে, এজন্য একে মাশরুম গ্রন্থি বলে। শুক্রথলি থেকে অপেক্ষাকৃত একটি মোটা নালী আরো নীচের দিকে নেমে গেছে, এটিকে ক্ষেপণ নালী বলে। এটির সঙ্কোচন ও প্রসারণের সাহায্যে শুক্রাণু জনন থলি ও পুংজনন ছিদ্রপথে বাইরে নিক্ষিপ্ত হয়। কনগ্লোবেট গ্রন্থিটি ক্ষেপণ নালীর অঙ্কদেশের পশ্চাৎ প্রান্তে অবস্থিত, এ থেকে এক রকম বিশেষ গন্ধ নির্গত হয়, যাতে স্ত্রী আরশোলারা আকৃষ্ট হয়।

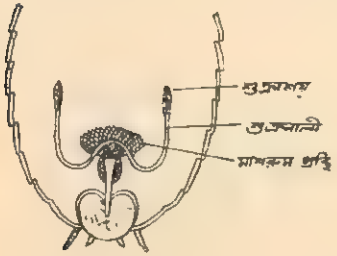

আরশোলার পুংজনন তন্ত্র

স্ত্রী আরশোলার স্ত্রীজনন তন্ত্র (1) ডিম্বাশয়, (২) ডিম্বনালী, (3) জননথলি, (4) জননছিদ্র, (5) শুক্রধানী ও (6) কোলেটা-রিয়েল নামক গ্রন্থির সাহায্যে গঠিত।

স্ত্রী আরশোলার পৌষ্টিক নালীর শেষের দিকে দুই পাশে দুইটি ডিম্বাশয় থাকে, ডিম্বাশয়ের মধ্যে ডিম্বাণু তৈরী হয়। ঐ ডিম্বাণুগুলি দুটি ডিম্বনালী-পথে নিঃসৃত হয়। ঐ ডিম্বনালী দুইটির শেষ প্রান্ত একসঙ্গে মিলিত হয়ে একটি সাধারণ নালীতে পরিণত হয়েছে এবং তা জননথলির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। জননথলি আবার জননছিদ্রের সঙ্গে

যুক্ত হয়েছে। ডিম্বনালী দুইটির মাঝখানে এক জোড়া শুক্রধানী থাকে, পুরুষ আরশোলার শুক্রাণু সাময়িকভাবে এই শুক্রধানীতে সঞ্চিত

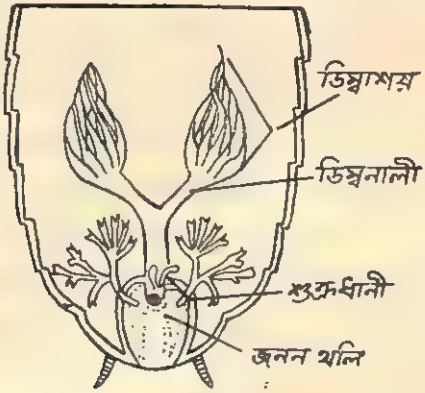

আরশোলার স্ত্রীজনন তন্ত্র

থাকে। শুক্রধানী দুইটি আবার নালিকার সাহায্যে জননথলির সঙ্গে যুক্ত থাকে। জননের সময় শুক্রাণুর সঙ্গে ডিম্বাণুর মিলনের ফলে ভ্রূণাণুর সৃষ্টি হয়। একে নিষেক (Fertilization) বলে। জননথলির মধ্যে এই নিষেক নিষ্পন্ন হয়। কোলেটারিয়াল গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত

আরশোলার ডিম্বথলিতে দুই সারিতে মোট ষোলটি ডিম্ব থাকে।

রাসায়নিক পদার্থ নিষিক্ত ডিমগুলির চারিদিক ঘিরে একটি শক্ত খোলস সৃষ্টি করে। এটি অনেকটা ছোট ব্যাগের মত দেখতে, এক দিক করাতের মত খাঁজ কাটা, জননথলির মধ্যেই এই ব্যাগটি কিছুদিন থাকে। তারপর স্ত্রী আরশোলা সুবিধামত জায়গায় এই ব্যাগটি প্রসব করে। এর মধ্যে 16টি নিষিক্ত ডিম্ব দুই সারিতে পাশাপাশি সাজান থাকে, ঐ থলের মধ্যেই নিষিক্ত ডিমগুলি শিশু আরশোলায় পরিণত হয় এবং খোলটি ফেটে গেলে তারা বাইরে বেরিয়ে আসে।

অমেরুদণ্ডী ঃ কেঁচো

(Earthworm)

কেঁচো অঙ্গুরীমাল পর্বভুক্ত একটি অমেরুদণ্ডী প্রাণী। কেঁচোর দেহ অঙ্গুরীর মত, দেহখণ্ড অনেকগুলি পর পর জুড়ে গঠিত। কেঁচোর দেহ একটি পাতলা, স্বচ্ছ, নরম আবরণীতে (Cuticle) ঢাকা। এই আবরণীর নীচেই রয়েছে বহিঃত্বক। এই বহিঃত্বকের কিছু অংশ গ্রন্থিতে রূপান্তরিত হয়ে শ্লেষ্মা সৃষ্টি করে। এই শ্লেষ্মা গমনপথকে পিচ্ছিল করে কেঁচোর গমনে সাহায্য করে, শ্বাসকার্যেও তা সাহায্য করে, ভিজা বহিঃত্বকের মধ্য দিয়ে বাতাস সহজে দেহের মধ্যে প্রবেশ করে। বহিঃত্বকের কিছু কোষ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কাজও করে। বহিঃত্বকের নীচে আছে এক স্তর চক্রপেশী। চক্রপেশীর নীচে রয়েছে এক স্তর অনুদৈর্ঘ্য পেশী। চক্রপেশীর সঙ্কোচনের ফলে দেহ প্রসারিত হয় এবং অনুদৈর্ঘ্য পেশীর সঙ্কোচনের ফলে দেহ সঙ্কুচিত হয়। কেঁচোর গমনে এই প্রক্রিয়াটি সাহায্য করে। কেঁচোর দেহের বিভিন্ন তন্ত্র ও তার কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নীচে দেওয়া হল।

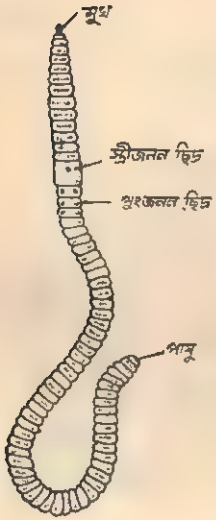

কেঁচোর বহিরাকৃতি

1. **পৌষ্টিক তন্ত্র ঃ** কেঁচোর পৌষ্টিক তন্ত্র (ক) **পৌষ্টিক নালী** (খ) **লালাগ্রন্থি নিয়ে তৈরী।**

(ক) **পৌষ্টিক নালী ঃ** পৌষ্টিক নালী মুখছিদ্র হতে সুরু করে পায়ুতে গিয়ে শেষ হয়েছে। এটি নিম্নলিখিত অংশ নিয়ে গঠিত।

(1) **মুখছিদ্র ঃ** এটি অর্ধচন্দ্রাকার একটি ছিদ্র। এই পথে কেঁচো খাদ্য গ্রহণ করে।

(2) **মুখবিবর ঃ** মুখবিবরের প্রাচীর ভাঁজযুক্ত এবং সঙ্কোচন ও প্রসারণে সক্ষম, খাদ্যগ্রহণে এই অংশ সাহায্য করে।

(3) **গলবিল ঃ** মুখবিবরের পরের এই অংশকে গলবিল বলে। এই অংশে খাদ্যের সঙ্গে লালা মিশ্রিত হয়।

(4) **গ্রাসনালী ঃ** গলবিলের পরের অংশ হল গ্রাসনালী। এর শেষ অংশে একটি পেশীবহুল চর্বণযন্ত্র বা গিজার্ড আছে, এই অংশে খাদ্য নিষ্পেষিত হয়।

(5) **পাকস্থলী ঃ** গিজার্ডের পর থেকে পাকস্থলী আরম্ভ হয়েছে। গলবিল, গ্রাসনালী ও পাকস্থলীতে নানারকম এনজাইমের সহায়তায় খাদ্য পরিপাক হয়।

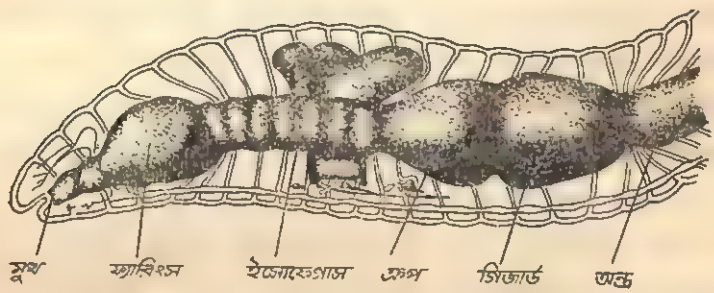

কেঁচোর পৌষ্টিক নালী

(6) **অন্ত্র ঃ** পাকস্থলীর পর থেকে মলাশয় পর্যন্ত অংশকে অন্ত্র বলে। অন্ত্রের কাজ হল খাদ্য পরিপাক ও শোষণ।

(7) **মলাশয় ঃ** পৌষ্টিক নালীর শেষ অংশকে মলাশয় বলে। এই অংশে মল সঞ্চিত থাকে।

(8) (ক) **পায়ু ঃ** পৌষ্টিক নালীর শেষে একটি গোলাকার ছিদ্রযুক্ত পায়ু আছে। খাদ্যের যে অংশ জীর্ণ হয় না বা প্রয়োজনে লাগে না তা পায়ু দিয়ে বেরিয়ে যায়। আমরা কেঁচোর গর্তমুখে এই অজীর্ণ মলই দেখতে পাই।

(খ) **লালা গ্রন্থি ঃ** গলবিলের ওপরে লালা গ্রন্থি আছে। লালা খাদ্যবস্তুকে গিলতে ও প্রোটিন পরিপাকে সাহায্য করে।

2. **রক্ত-সংবহন তন্ত্র ঃ** কেঁচোর রক্ত-সংবহন তন্ত্র আরশোলার চেয়ে জটিল। কেঁচোর দেহে রক্ত সঞ্চালনের মাধ্যমে সরল খাদ্য উপাদানগুলি পাকস্থলী থেকে প্রতিটি জীবকোষে পরিবাহিত হয়। কেঁচোর দেহে আরশোলার মত কোন হৃৎপিণ্ড নেই, তার বদলে চার জোড়া স্পন্দনশীল রক্তনালী আছে, যাদের অনবরত স্পন্দনের ফলে দেহের সকল রক্তনালী (Blood Vessel) দিয়ে কেঁচোর রক্ত চক্রাকারে আবর্তিত হয়ে থাকে। এই রক্তনালীগুলি অসংখ্য শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে সূক্ষ্ম ও অতি পাতলা দেওয়ালবিশিষ্ট রক্তজালক বা ক্যাপিলারীতে পরিণত হয়। এই ক্যাপিলারীগুলিই দেহের প্রতিটি কোষ ও পাকস্থলীর ভেতরের আবরণের সঙ্গে যুক্ত থাকে। রক্ত-সংবহন প্রক্রিয়ায় এই ক্যাপিলারীগুলির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ক্যাপিলারার পাতলা দেওয়ালের মধ্য দিয়ে খাদ্য ও জলের অংশ পাকস্থলী থেকে রক্তের মধ্যে এসে প্রবিষ্ট হয় এবং রক্ত থেকে জীবকোষের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়।

কেঁচোর রক্ত সব সময় রক্তনালীর মধ্যেই আবদ্ধ থাকে। এই ধরনের সংবহন তন্ত্রকে বদ্ধ সংবহন তন্ত্র বা ক্লোজড্ সিস্টেম বলে। আমাদের দেহের রক্ত-সংবহন তন্ত্রও এই ধরনের। আরশোলা ও অন্যান্য পতঙ্গদের রক্ত-সংবহন তন্ত্র কিন্তু মুক্ত সংবহন তন্ত্র—সে কথা আগেই বলা হয়েছে। কেঁচোর রক্তনালীর মধ্যে কপাটিকা বা ভাল্‌ব্ থাকায় রক্ত কেবল একই পথে চক্রাকারে বারবার আবর্তিত হয়ে থাকে। কেঁচোর রক্তে হিমোগ্লোবিন আছে, তাই তাদের রক্তের রং লাল। খাদ্যবস্তু ছাড়াও এই রক্তের সাহায্যে অক্সিজেন পরিবাহিত হয়ে থাকে যা শ্বসনক্রিয়ায় কাজে লাগে।

3. **শ্বসন তন্ত্র ঃ** কেঁচো ভিজা বহিঃত্বক বা কিউটিকলের মধ্য দিয়ে শ্বসনের জন্য বাতাস গ্রহণ করে থাকে। শাখায়-প্রশাখায় বিভক্ত

অসংখ্য রক্তজালক জালের আকারে কেঁচোর দেহের মধ্যে বিস্তৃত আছে এবং তার মধ্য দিয়ে রক্ত যখন চক্রাকারে পরিবাহিত হয়ে থাকে তখন রক্তের হিমোগ্লোবিনের অংশ বাতাস থেকে অক্সিজেন সংগ্রহ করে কোষগুলিতে পৌঁছে দেয় শ্বসনক্রিয়ার জন্য। শ্বসনক্রিয়ার সময় যে দূষিত কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয় তাও এ রক্তের মাধ্যমে পরিবাহিত হয়ে বাইরে পরিত্যক্ত হয়।

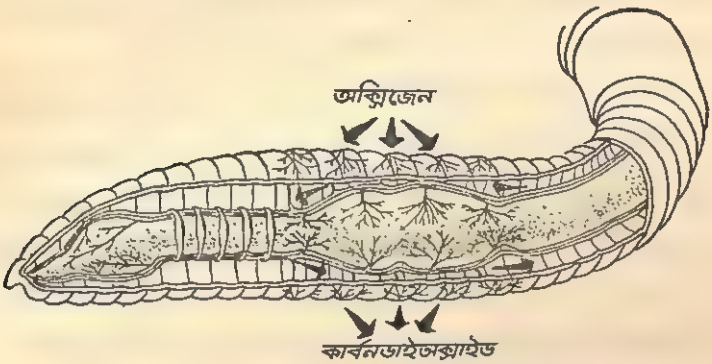

ভিজা বহিঃত্বকের সাহায্যে কেঁচোর শ্বাসকার্য

4. **রেচন তন্ত্র** ঃ কেঁচোর রেচন তন্ত্র সরল ও অসম্পূর্ণ। কেঁচোর দেহের বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশনের জন্য বিশেষ ধরনের কুণ্ডলীকৃত নালিকা আছে যার নাম **নেফ্রিডিয়াম** (Nephridium, plural—Nephridia)। নেফ্রিডিয়ামের দুই প্রান্তই উন্মুক্ত, যে প্রান্ত দেহগহ্বরের মধ্যে থাকে তা ফানেলের আকারবিশিষ্ট ও সিলিয়াযুক্ত। অন্য প্রান্ত সাধারণতঃ রেচন নালীর সঙ্গে মিশেছে। অসংখ্য কৌশিক নালী বা রক্তজালকের সঙ্গে এই নেফ্রিডিয়ামগুলির সংস্পর্শ আছে, যার ফলে রক্তমধ্যস্থ বর্জ্য পদার্থগুলি নিয়মিতভাবে নেফ্রিডিয়ামের মধ্যে জমা হয়ে থাকে, তারপর রেচননালী-পথে অন্ত্রে আসে এবং অবশেষে পায়ুপথে দেহ হতে বের হয়ে যায়। কেঁচোর দেহে অসংখ্য নেফ্রিডিয়াম আছে। কতকগুলি নেফ্রিডিয়ামের প্রান্ত আবার দেহগাত্রের সূক্ষ্ম ছিদ্রের সঙ্গেও যুক্ত

থাকে যার মধ্য দিয়ে দেহের বর্জ্য পদার্থগুলি নিয়মিতভাবে দেহের বাইরে পরিত্যক্ত হয়।

5. **নার্ভ তন্ত্র ঃ** কেঁচোরা আলো, তাপ ও স্পর্শের অনুভূতি গ্রহণ করতে সক্ষম। এদের কোন চোখ বা শুঁড় নেই। এদের বহিঃত্বকে অনেকগুলি লম্বা লম্বা গ্রাহক কোষ আছে, ঐগুলির সাহায্যেই তারা আলো, উত্তাপ ও স্পর্শের অনুভূতি গ্রহণ করে থাকে। মুখের মধ্যে এদের স্বাদ ও গন্ধ গ্রহণ করবার জন্য গ্রাহক কোষ আছে, যার সাহায্যে কেঁচোরা কোন বস্তুর স্বাদ ও গন্ধ বুঝতে পারে।

কেঁচোর দেহের স্নায়ুতন্ত্রের প্রধান অংশটি খাদ্যনালীর নীচে লম্বা-লম্বিভাবে অবস্থিত। এটিকে ভেন্ট্রাল নার্ভকর্ড বলে। এটি একটি লম্বা সূতার মত দেখতে হলেও বাস্তবিক পক্ষে দুটি নার্ভকর্ডের মিলনে তৈরী হয়েছে। এই ভেন্ট্রাল নার্ভকর্ডের মাঝে মাঝে অনেকগুলি স্থূল অংশ আছে। এগুলিকে নার্ভগ্রন্থি বা নার্ভ গ্যাংগ্লিয়ন বলে (অনেকগুলি নার্ভ-দেহকোষের একত্র মিলনে নার্ভ গ্যাংগ্লিয়ন তৈরী হয়)। এই নার্ভগ্রন্থি থেকে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নার্ভ বেরিয়ে দেহের বিভিন্ন অংশে বিস্তৃত হয়েছে এবং কেঁচোর দেহের বিভিন্ন গ্রাহক কোষগুলির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। কেঁচোর দেহের তৃতীয় খণ্ডে খাদ্যনালীর ওপরে এক জোড়া পরস্পরযুক্ত স্থূল নার্ভগ্রন্থি আছে, এটিকে কেঁচোর মস্তিষ্ক বলে। এই দুটি নার্ভগ্রন্থির প্রত্যেকটি থেকেই একটি করে সূতার মত নার্ভ বেরিয়ে পরস্পর মিলিত হয়ে ভেন্ট্রাল নার্ভকর্ড গঠন করেছে।

6. **জনন তন্ত্র ঃ** কেঁচো উভলিঙ্গ প্রাণী। অর্থাৎ প্রত্যেকটি কেঁচোর দেহের মধ্যে পুরুষ ও স্ত্রী উভয় অঙ্গই বর্তমান।

পুংজনন তন্ত্র ঃ কেঁচোর পুংজনন তন্ত্র দুইজোড়া শুক্রাশয়, দুই জোড়া শুক্রথলি, শুক্রচুঙ্গী, শুক্রনালিকা, প্রোস্টেট গ্রন্থি, দুটি পুংজনন ছিদ্র ও চারিটি জনন পিড়িকা নিয়ে গঠিত। শুক্রাশয়ে শুক্রকোষ উৎপন্ন হয় এবং তা শুক্রথলিতে এসে সাময়িকভাবে জমা থাকে এবং শুক্রথলির রসে শুক্রাণুগুলি পুষ্টিলাভ করে। জননের

সময় ঐ শুক্রাণু শুক্রচুঙ্গী ও শুক্রনালিকার মধ্য দিয়ে পুংজনন ছিদ্রপথে নির্গত হয়। জনন পিড়িকা জননকার্যে সাহায্য করে।

স্ত্রীজনন তন্ত্র : কেঁচোর স্ত্রীজনন তন্ত্র দুটি ডিম্বাশয়, দুটি ডিম্ব-চুঙ্গী, দুটি ডিম্বনালী, একটি স্ত্রীজনন ছিদ্র ও আটটি শুক্রধানী নিয়ে গঠিত। ডিম্বাশয়ে ডিম্বাণু তৈরী হয়, ঐ ডিম্বাণু ডিম্বচুঙ্গীর মধ্য দিয়ে ডিম্বনালীর মধ্যে আসে। আটটি শুক্রধানীর মধ্যে অসংখ্য শুক্রাণু সাময়িকভাবে জমা থাকে। ডিম্বনালীর মধ্যে একটি ডিম্বাণুর সঙ্গে একটি শুক্রাণুর মিলনের ফলে একটি ভ্রূণাণুর সৃষ্টি হয়। একে নিষেক (Fertilization) বলে। নিষিক্ত ডিম্বগুলি তারপর স্ত্রীজনন ছিদ্র দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। একটি কেঁচো এইভাবে অসংখ্য ডিম দিয়ে থাকে। প্রতিটি নিষিক্ত ডিম থেকে একটি কেঁচো হয়। অনেক জাতীয় কেঁচো নিষিক্ত ডিমগুলি একটি গুটি বা ককুনের মধ্যে রেখে দেয়, পরে গুটি ভেঙে কেঁচোর বাচ্চারা বেরিয়ে আসে।

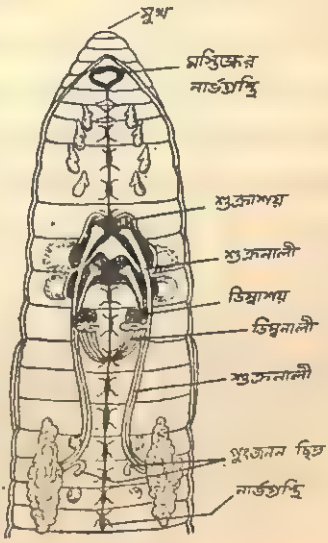

কেঁচোর জনন তন্ত্র ও নার্ভ তন্ত্র

কেঁচো উভলিঙ্গ প্রাণী হলেও একই সময় একই কেঁচোর দেহে পুংজনন তন্ত্র ও স্ত্রীজনন তন্ত্র পরিপূর্ণতা লাভ করে না। তাই জননের সময় দুটি কেঁচোর পরস্পর মিলিত হবার প্রয়োজন হয় এবং একটি কেঁচোর শুক্রাণুর সঙ্গে অপর কেঁচোর ডিম্বাণুর মিলনে ভ্রূণাণুর সৃষ্টি হয়।

মেরুদণ্ডী : কুনো ব্যাঙ

(Vertebrate : Toad)

যে-সব প্রাণীর শিরদাঁড়া বা মেরুদণ্ড থাকে তাদের মেরুদণ্ডী (Vertebrate) প্রাণী বলে। মাছ, সরীসৃপ, পক্ষী, স্তন্যপায়ী ও উভচর ব্যাঙ—এরা সবাই মেরুদণ্ডী প্রাণী। মেরুদণ্ডী প্রাণীর দেহের মধ্যেই কঙ্কাল থাকে, তাই তাদের অন্তঃকঙ্কাল (Endoskeleton) প্রাণী বলে। এই কঙ্কালটিই দেহের নরম অংশগুলিকে ধরে রাখে, বাইরের আঘাত থেকে সেগুলিকে রক্ষা করে, প্রাণীকে নির্দিষ্ট একটি আকার প্রদান করে, সেই সঙ্গে দেহের ভার বহন করেও থাকে। শিশু অবস্থা থেকে একটি নির্দিষ্ট বয়স অবধি এই কঙ্কালটি ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে, মেরুদণ্ডী প্রাণীর আকারও সেই সঙ্গে বড় হয়।

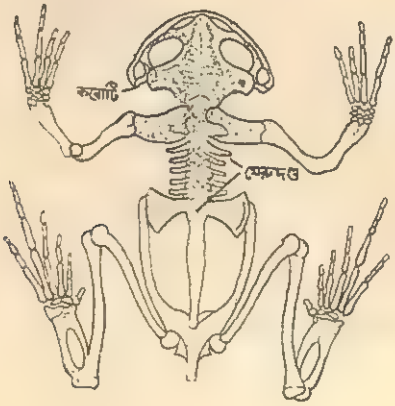

কুনো ব্যাঙের অস্থির কাঠামো

অস্থি তন্ত্র (Skeletal system) : কুনো ব্যাঙের অস্থি তন্ত্র কতকগুলি কঠিন অস্থি ও তরুণ অস্থির সমন্বয়ে গঠিত এবং দুইটি প্রধান ভাগে বিভক্ত, যথা : **অক্ষীয় কঙ্কাল** (Axial skeleton) ও **উপাঙ্গিক কঙ্কাল** (Appendicular skeleton)।

অক্ষীয় কঙ্কাল ঃ কঙ্কালের যে অংশটি মাথার খুলি বা করোটি ও মেরুদণ্ড নিয়ে গঠিত এবং দেহের মধ্যরেখা বরাবর অবস্থিত তাকে অক্ষীয় কঙ্কাল বলে।

(ক) **করোটি** (Skull) ঃ করোটিকে সাধারণ কথায় মাথার খুলি বলে। এটি একটি অস্থিময় বাক্সের মত, ভিতরের অংশ ফাঁপা, যার মধ্যে ব্রেন বা মস্তিষ্ক থাকে। করোটিটি করোটিকা (Cranium), ওপরের চোয়াল, নীচের চোয়াল ও হাওয়েড যন্ত্র (Hyoid apparatus) নিয়ে গঠিত। করোটির প্রধান অংশটি অর্থাৎ যে অংশটি মস্তিষ্ককে আবদ্ধ রাখে তাকে **করোটিকা** (Cranium or Brain-box) বলে। এই করোটিকার পশ্চাৎ প্রান্তে একটি বড় ছিদ্র আছে। এই ছিদ্রকে বলে **ফোরামেন ম্যাগনাম** (Foramen magnum)। এই ছিদ্রটির মধ্য দিয়ে মস্তিষ্কের একটি অংশ প্রলম্বিত হয়ে **সুষুম্না কাণ্ড বা স্পাইনাল কর্ড** রূপে (Spinal cord) মেরুদণ্ডের ভেতর প্রবেশ করেছে। করোটিকা কয়েক জোড়া অস্থির সাহায্যে গঠিত। এই অস্থিগুলি এমনভাবে জোড়া যে সেগুলি অচল বা স্থির থাকে, অর্থাৎ নাড়ান যায় না। ব্যাঙের **উপরের চোয়াল** (Upper jaw) করোটিকার সঙ্গে যুক্ত ; অর্থাৎ উপরের চোয়ালটি নাড়ান যায় না। ব্যাঙ যখন খাবার সময় হাঁ করে তখন নীচের চোয়ালটিই নামায়, উপরের চোয়ালটি স্থির থাকে। এই **নীচের চোয়ালটিও** (Lower jaw) করোটির একটি অংশ এবং এটি করোটির সঙ্গে এমনভাবে সংলগ্ন যা সহজে নাড়ান যায়। আমরাও ঠিক এইভাবে মুখের হাঁ করি। কুনো ব্যাঙের চোয়ালে দাঁত নেই, সোনা ব্যাঙের চোয়ালে দাঁত আছে। করোটিতে কয়েকটি **ইন্দ্রিয় কোটর** আছে ; যথা—**চক্ষু কোটর, কর্ণ কোটর, নাসিকা কোটর**। করোটির আর একটি অংশ **হাওয়েড অ্যাপারেটাস** (Hyoid apparatus) মুখবিবরের তলায় অবস্থিত, এটি ভিতরের অংশগুলিকে ধরে রাখে এবং এটি তরুণাস্থি দ্বারা গঠিত।

মেরুদণ্ড ঃ কুনো ব্যাঙের মেরুদণ্ডটি দশটি অস্থিখণ্ড বা **কশেরুকা**

(Vertebrae) নিয়ে গঠিত। লম্বা দণ্ড আকারের দশম কশেরুকাকে **ইউরোস্টাইল** (Urostyle) বলে। এই মেরুদণ্ডটি করোটির নীচ থেকে ধড়ের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। এই মেরুদণ্ডটির ওপর করোটিটি এমনভাবে বসান থাকে যা সহজে নাড়ান যায়। প্রত্যেকটি কশেরুকার মধ্যে গোলাকার গর্ত আছে, কশেরুকাগুলি আংটির মত এবং ঐগুলি পর পর সজ্জিত থাকার ফলে তাদের মধ্যে একটি সুড়ঙ্গ বা নলের মত লম্বা গহ্বরের সৃষ্টি হয়, তার মধ্যে সুষুম্নাকাণ্ড বা স্পাইনাল কর্ড থাকে। ইউরোস্টাইলের মধ্যেও সরু গহ্বর আছে, তার মধ্যে সুষুম্নাকাণ্ডের শেষ প্রান্তটি থাকে। কশেরুকাগুলি বন্ধনী বা লিগামেন্টের সাহায্যে পরস্পর আবদ্ধ থাকে, মেরুদণ্ডটি তাই সামান্য বাঁকান যায়। দুইটি কশেরুকা যেখানে পরস্পর সংলগ্ন সেখানে প্রত্যেক পাশে ফাঁক থাকে। এই ফাঁক দিয়ে সুষুম্নাকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত নার্ভ বেরিয়ে আসে এবং দেহের অন্যত্র পরিব্যাপ্ত হয়। মানুষের মেরুদণ্ডে 33টি কশেরুকা আছে। মানুষের মেরুদণ্ডটি অনেক বেশী লম্বা।

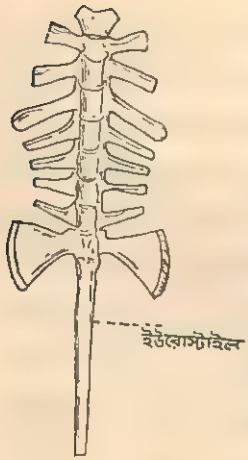

কুনো ব্যাঙের মেরুদণ্ড

উপাঙ্গিক কঙ্কাল: কুনো ব্যাঙের উপাঙ্গিক কঙ্কাল অগ্র ও পশ্চাৎপদের অস্থির কাঠামো, উরশ্চক্র ও শ্রোণীচক্র নিয়ে গঠিত।

অগ্রপদের অস্থি: অগ্রপদের ওপরের অংশের অস্থিকে **হিউমেরস** (Humerus) বলে। তার ঠিক নীচেই রেডিয়স ও আলনা নামে দুইটি অস্থির মিলনে একটি অস্থি অবস্থিত, তার নাম **রেডিয়ো-আলনা**। এর পরেই কব্জির অংশে প্রতি সারিতে তিনটি করে মোট ছয়টি

ছোট ছোট অস্থি দুইটি সারিতে সাজান থাকে, এগুলিকে **করপাল** (Carpals) বলে। ব্যাঙের করতল অংশে চারিটি লম্বা **মেটাকরপাল** (Metacarpal) অস্থি আছে এবং চারিটি আঙ্গুলে ছোট ছোট অনেকগুলি অঙ্গুলাস্থি বা **ফ্যালেনজেস** (Phalanges) আছে।

পশ্চাৎপদের অস্থি ঃ পশ্চাৎপদের উরুদেশের অস্থিকে **ফিমার** (Femur) বলে। তার ঠিক নীচেই **টিবিয়া** ও **ফিবিউলা** নামক দুইটি অস্থির মিলনে **টিবিয়ো-ফিবিউলা** নামে একটি অস্থি আছে। গোড়ালির ভেতরকার অস্থিগুলিকে **টারসাল** বলে এবং তা দুই সারিতে অবস্থিত। প্রথম সারির দুইটি অস্থি বেশ লম্বা ও দুপ্রান্তে পরস্পর যুক্ত, পরের সারির অস্থি দুটি খুবই ছোট। পদতলে পাঁচটি **মেটাটার-সাল** এবং পেছনের পায়ের পাঁচটি আঙ্গুলে অনেকগুলি ছোট ছোট **ফ্যালেনজেস** আছে।

উরশ্চক্র ঃ কুনো ব্যাঙের ধড়কে ঘিরে যে অস্থিগুলি রয়েছে তাই নিয়ে **উরশ্চক্র** বা **বক্ষবেষ্টনী** (Pectoral girdle) গঠিত। এটি ভেতরের কোমল অংশগুলিকে রক্ষা করে বাইরের আঘাত থেকে। ব্যাঙের অগ্রপদের হিউমেরসের বর্তুলাকার প্রান্তটি বল ও সকেট পদ্ধতিতে এই উরশ্চক্রের সঙ্গে যুক্ত, তার ফলে সামনের পা দুটি ইচ্ছামত এদিক-ওদিক ঘোরান যায়।

শ্রোণীচক্র ঃ দেহের কোমরের অংশের অস্থিচক্রকে **শ্রোণীচক্র** (Pelvic girdle) বলে। দেখতে এটি ইংরাজী V অক্ষরের মত। এই শ্রোণীচক্রের সঙ্গে পেছনের পায়ের ফিমার অস্থির বর্তুলাকার প্রান্তটি বল ও সকেট পদ্ধতিতে যুক্ত থাকায় সামনের পায়ের মত পেছনের পা দুটিও ব্যাঙেরা ইচ্ছামত সঞ্চালন করতে পারে। মানুষের কঙ্কাল তন্ত্রের এই অংশগুলি অর্থাৎ হাত, পা, উরশ্চক্র ও শ্রোণীচক্র মোটামুটি একই পদ্ধতিতে গঠিত।

পৌষ্টিক তন্ত্র (Alimentary system) **ঃ** কুনো ব্যাঙের পৌষ্টিক তন্ত্র **পৌষ্টিক নালী** ও পরিপাক ক্রিয়ার সহায়ক কয়েকটি **গ্রন্থি** নিয়ে

গঠিত। ব্যাঙের পৌষ্টিক নালিটি মুখ থেকে আরম্ভ হয়ে পশ্চাদ্-ভাগের ছিদ্রটি পর্যন্ত বিস্তৃত। মানুষেরও পৌষ্টিক নালী মুখছিদ্র

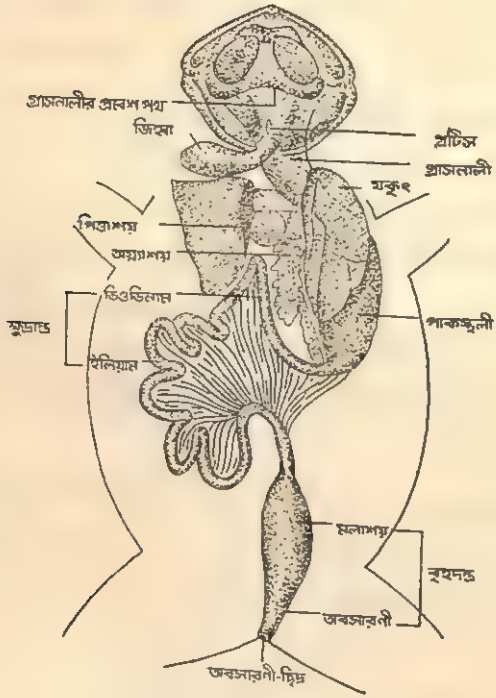

কুনো ব্যাঙের পৌষ্টিক তন্ত্র

থেকে পায়ুছিদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত। এই পৌষ্টিক নালীটি খাদ্যনালী নামেও পরিচিত। পৌষ্টিক নালীটি নিম্নলিখিত অংশ নিয়ে গঠিত।

মুখছিদ্র ঃ কুনো ব্যাঙের মুখছিদ্রটি বেশ চওড়া এবং দন্তহীন দুইটি চোয়াল দ্বারা বেষ্টিত।

মুখবিবর ঃ কুনো ব্যাঙের মুখের ভেতরের প্রশস্ত অংশকে মুখবিবর বলে। মুখবিবরের মেঝেতে একটি মাংসল জিব আছে। ব্যাঙের জিবটি খুবই বিচিত্র, এর সামনের অংশটি মুখবিবরের সামনের অংশের সঙ্গে জোড়া থাকে, কিন্তু জিবের পেছনের অংশটি মুক্ত থাকে এবং গলার দিকে প্রসারিত থাকে। ব্যাঙের কোন পতঙ্গ ধরবার প্রয়োজন হলে হঠাৎ

দীর্ঘ জিবটি মুখ থেকে উল্টে বার করে পতঙ্গকে ধরে, তারপর আবার জিবটি উল্টে মুখের মধ্যে টেনে নেয়। ব্যাঙের মুখবিবরের ওপর দিকে **দুইটি অন্তঃনাসারন্ধ্রের** ছিদ্র আছে। মুখবিবরের মেঝেতে, জিবের গোড়ায় একটি ছোট ছিদ্র থাকে। এটি **শ্বাসছিদ্র বা গ্লটিস** (Glottis)। শ্বাসছিদ্রের মাধ্যমে মুখবিবর শ্বাসনালীর সঙ্গে যুক্ত।

গ্রাসনালী : মুখবিবরটি ক্রমশঃ সরু হয়ে গ্রাসনালীতে পরিণত হয়েছে। খাদ্যবস্তু পাকস্থলীতে চালনা করাই এর প্রধান কাজ।

পাকস্থলী : গ্রাসনালীর পরেই পুরু প্রাচীরযুক্ত থলির মত পৌষ্টিক নালীর অংশটিকে পাকস্থলী বলে। পাকস্থলীর প্রাচীরে বহু গ্রন্থি আছে। এই গ্রন্থি থেকে **পাচক রস** নির্গত হয়। এই পাচক রসের সাহায্যে পাকস্থলীতে খাদ্য আংশিকভাবে জীর্ণ হয় এবং তা সাময়িকভাবে জমা থাকে।

ক্ষুদ্রান্ত্র : পাকস্থলীর পর থেকে ক্ষুদ্রান্ত্রের সুরু হয়েছে। ক্ষুদ্রান্ত্র সরু ও আংশিকভাবে কুণ্ডলী পাকান। ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রথমাংশের নাম **ডিওডিনাম** ও পরের অংশের নাম **ইলিয়াম**। ইলিয়ামের অংশটিই কুণ্ডলী পাকান ও **মেসেনটারী** নামক পর্দার সাহায্যে দেহপ্রাচীরের সঙ্গে যুক্ত। ক্ষুদ্রান্ত্রের ভিতরই খাদ্যবস্তুর সম্পূর্ণ পরিপাক এবং তার শোষণ প্রায় সম্পূর্ণ হয়।

বৃহৎ অন্ত্র : ক্ষুদ্রান্ত্রের পরে পৌষ্টিক নালী মোটা নলের মত অংশটিকে বৃহৎ অন্ত্র বলে। একে **মলাশয়**ও বলা হয়। খাদ্যের অপাচ্য অংশ এখানে জমা থাকে এবং তা মলে পরিণত হয়। বৃহৎ অন্ত্রের সাহায্যে কিছু জল ও লবণ শোষিত হয়। পৌষ্টিক নালীর শেষ প্রান্তে অবসারণীর ছিদ্রপথে মল দেহের বাইরে নিক্ষিপ্ত হয়।

পৌষ্টিক গ্রন্থি : ব্যাঙের দেহে দুইটি প্রধান পৌষ্টিক গ্রন্থি আছে, যথা যকৃৎ (Liver) ও অগ্ন্যাশয় (Pancreas)। এ ছাড়াও পাকস্থলী ও ক্ষুদ্রান্ত্রের দেহস্তরে অসংখ্য সূক্ষ্ম গ্রন্থি আছে।

যকৃৎ : ব্যাঙের হৃৎপিণ্ডের দুই পাশে গাঢ় খয়েরি রঙের দুইটি বড় খণ্ড ও সংযোগকারী একটি মধ্যখণ্ড নিয়ে যকৃৎ গঠিত। যকৃতে পিত্ত উৎপন্ন হয় এবং ঐ পিত্ত যকৃতের মধ্যখণ্ডের ওপর অবস্থিত একটি পিত্তথলিতে সাময়িকভাবে জমা হয় এবং পরিশেষে একটি পিত্তনালীর সাহায্যে তা ক্ষুদ্রান্ত্রের ডিওডিনামের মধ্যে বাহিত হয়। এই পিত্তরস খাদ্য পরিপাকে সাহায্য করে।

অগ্ন্যাশয় : এই গ্রন্থিটির আকার লম্বা ও ফিকা হলুদ রঙের। এটি পাকস্থলী ও ডিওডিনামের মধ্যস্থলে অবস্থিত। অগ্ন্যাশয় থেকে অগ্ন্যাশয় রস নিঃসৃত হয় এবং তা পিত্তনালীর মধ্য দিয়েই ডিওডিনামের মধ্যে বাহিত হয়। এই অগ্ন্যাশয় রসও খাদ্য পরিপাকে বিশেষভাবে সাহায্য করে। মানুষের দেহেও এই যকৃৎ ও অগ্ন্যাশয় আছে এবং এই দুইটি গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত রস আমাদের খাদ্য পরিপাকে সাহায্য করে।

শ্বসন তন্ত্র (Respiratory system) **:** শ্বাসকার্য জীবনের অন্যতম প্রধান লক্ষণ। জীবমাত্রই শ্বসনের সময় অক্সিজেনের সাহায্যে খাদ্য-বস্তু জারিত (Oxidized) করে শক্তি সংগ্রহ করে থাকে। ঐ শক্তির সাহায্যে জীব নানা রকম কাজকর্ম করে থাকে। শ্বসনের সময় জীব সাধারণতঃ বাতাস অথবা জল থেকে অক্সিজেন সংগ্রহ করে থাকে। ব্যাঙ উভচর প্রাণী। ডিম ফোটবার পর ব্যাঙাচিরা জলের মধ্যে কিছুকাল বাস করে, তখন শ্বসনের সময় ব্যাঙাচিরা মাথার পিছনের তিন জোড়া বহিঃস্থ ফুলকোর (External gill) সাহায্যে মাছের মত জল থেকেই অক্সিজেন সংগ্রহ করে থাকে। ব্যাঙাচিরা শুধু বহিঃস্থ ফুলকোর সাহায্যেই নয়, দেহের পাতলা চামড়ার মধ্য দিয়েও অক্সিজেন নিয়ে শ্বাসকার্য করে।

ব্যাঙাচি অবস্থার শেষের দিকে ফুলকোগুলি লুপ্ত হয়, তখন ব্যাঙ তার সদ্যসৃষ্ট দুটি ফুসফুসের (Lungs) সাহায্যে শ্বাসকার্য সুরু করে। এই ফুসফুস উচ্চশ্রেণীর প্রাণীর একটি বৈশিষ্ট্য।

ব্যাঙের দুইটি ফুসফুস হৃৎপিণ্ডের দুই পাশে থাকে। ব্যাঙের এই ফুসফুস দুইটিতে স্পঞ্জের মত অসংখ্য ছোট ছোট প্রকোষ্ঠ আছে, এগুলিকে অ্যালভিওলি বলে। এই প্রকোষ্ঠগুলির প্রাচীর অত্যন্ত পাতলা এবং অসংখ্য রক্তজালক এই প্রাচীরের গাত্রে অবস্থিত। শ্বাসগ্রহণের সময় ব্যাঙের নাকের দুটি ছিদ্র দিয়ে মুখবিবরের মধ্যে বাতাস প্রবেশ করে, ব্যাঙ তখন মুখ বুজে থাকে। মুখবিবরের তলায় পেশীর সঙ্কোচন-প্রসারণের ফলে ঐ বাতাসের ওপর যে চাপ সৃষ্টি হয় তার ফলে ঐ বাতাস শ্বাননালী দিয়ে ফুসফুসের মধ্যে প্রবেশ করে।

কুনো ব্যাঙের ফুসফুস

ফুসফুসের মধ্যে ঐ বাতাস প্রবেশ করার পর তা অ্যালভিওলির রক্তজালকের পাতলা প্রাচীর ভেদ করে রক্তের সংস্পর্শে আসে, এবং

ব্যাঙের শ্বাস গ্রহণ

রক্তের লোহিত কণিকার হিমোগ্লোবিনের অংশ ঐ বাতাস থেকে অক্সিজেন শোষণ করে নেয় এবং রক্ত যে দূষিত কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস দেহের অন্যান্য কোষ থেকে বহন করে আনে তা এই স্থানে ঐ বাতাসে

যোগ হয়। এইভাবে ফুসফুসের মধ্যেই বাতাস থেকে অক্সিজেনের অংশ রক্তের মধ্যে যোগ হয় এবং দূষিত কার্বন ডাইঅক্সাইড রক্ত থেকে পরিত্যক্ত হয়ে বাতাসে যোগ হয়। এই সময় ব্যাঙের উদরের পেশী ও ফুসফুসের পেশীর সঙ্কোচনের ফলে ফুসফুসের মধ্যে আবদ্ধ বাতাসের ওপর যে চাপ সৃষ্টি হয় তার ফলে ঐ বাতাস নাসারন্ধ্রপথে বাইরে বেরিয়ে আসে। এইভাবে ব্যাঙ শ্বাস ত্যাগ করে।

রক্ত ফুসফুসের মধ্যস্থ বাতাস থেকে অক্সিজেন সংগ্রহ করে প্রতিটি কোষে পৌঁছে দেয়। ঐ অক্সিজেনের সহায়তায়ই প্রতিটি কোষে সরল খাদ্যকণা জারিত হয়ে শক্তি সংগৃহীত হয়। **এইভাবে প্রতিটি কোষের মধ্যেই শ্বসনক্রিয়া ঘটে থাকে।**

ব্যাঙ ফুসফুস ছাড়াও মুখবিবর ও গলবিলের শ্লেষ্মাঝিল্লি এবং ভিজা ত্বকের মধ্য দিয়েও শ্বাসকার্যের জন্য গ্যাসের আদান-প্রদান করে থাকে। ত্বকের মধ্য দিয়ে গ্যাসের আদান-প্রদান সাধারণতঃ অতি অল্প হয়। তবে শীতকালে ব্যাঙ যখন সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় হয়ে দীর্ঘ শীতঘুমে (Hybernation) আচ্ছন্ন থাকে তখন ত্বকের মধ্য দিয়েই তার শ্বাসকার্য চলে।

মানুষ কেবল ফুসফুসের সাহায্যেই শ্বাসকার্য করে, মানুষের ত্বক বা ফুলকোর সাহায্যে শ্বাসকার্যের কোন ব্যবস্থা নেই। মানুষের বক্ষগহ্বরের তলায় যে পেশীবহুল মধ্যচ্ছদাটি আছে তার সঙ্কোচন ও প্রসারণের সাহায্যে ফুসফুসের সঙ্কোচন ও প্রসারণ যান্ত্রিক উপায়ে ঘটে থাকে।

রক্ত-সংবহন তন্ত্র (Circulatory system) ঃ কুনো ব্যাঙের রক্ত-সংবহন তন্ত্র রক্ত, ধমনী, শিরা, জালক ও হৃৎপিণ্ড নিয়ে গঠিত।

রক্ত ঃ তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা জেনেছি, রক্ত এক প্রকার যোগকলা (Connective tissue)। অন্যান্য যোগকলার সঙ্গে এর প্রধান পার্থক্য হল একটি তরল মাধ্যমে এর কোষগুলি ভাসমান অবস্থায় থাকে, এই তরল মাধ্যমকে বলে রক্তরস বা প্লাজমা এবং

ভাসমান কোষগুলিকে বলে রক্তকণিকা। একটি অণুবীক্ষণ যন্ত্রের তলায় ব্যাঙের এক বিন্দু রক্ত পরীক্ষা করলে দেখা যাবে তাতে অসংখ্য গোল বা ডিম্বাকার রক্তকোষ বা রক্তকণিকা রয়েছে। এই রক্তকণিকাগুলি তিন প্রকারের।

(ক) **লোহিত রক্তকণিকা :** এগুলি আকারে ডিম্বাকার এবং নিউক্লিয়াসযুক্ত, এতে **হিমোগ্লোবিন** (Haemoglobin) নামে এক রকম লৌহঘটিত জৈব পদার্থ থাকায় এগুলি লাল দেখায়, সেইজন্য রক্তের রঙও লাল। এদের সংখ্যা অন্যান্য কণিকার থেকে অনেক বেশী। মানুষের দেহের লোহিত রক্তকণিকায় কোন নিউক্লিয়াস থাকে না, আকারেও সেগুলি ছোট।

(খ) **শ্বেত রক্তকণিকা :** কুনোব্যাঙের শ্বেত কণিকাগুলি জলের মত বর্ণহীন, নিউক্লিয়াসযুক্ত ও অ্যামিবার মত চলাচল করতে পারে। এদের সংখ্যা লোহিত রক্তকণিকার থেকে অনেক কম।

(গ) **অণুচক্রিকা :** এই কোষগুলির আকার মাকুর মত এবং এতেও নিউক্লিয়াস আছে, এদের সংখ্যাও বেশী নয়।

রক্তের কাজ : রক্তের প্রধান কাজ হল (ক) শ্বাসকার্যের সময় বাতাস থেকে অক্সিজেন সংগ্রহ করে দেহের সকল জীবিত কোষে সরবরাহ করা এবং সেখান থেকে দূষিত কার্বন ডাইঅক্সাইড সংগ্রহ করে দেহের বাইরে নিষ্ক্রান্ত হতে সাহায্য করা। (খ) পৌষ্টিক তন্ত্র থেকে সরল খাদ্যবস্তু সংগ্রহ করে দেহের সকল জীবিত কোষে সরবরাহ করা। (গ) দেহের গ্রন্থিগুলি থেকে নানা রকম রস ও হরমোন দেহের বিভিন্ন কোষে সরবরাহ করা। (ঘ) দেহকোষের মধ্যে বিপাকক্রিয়ার ফলে যে-সব দূষিত পদার্থ উৎপন্ন হয় তা ঘর্ম ও মূত্রের সঙ্গে শরীরের বাইরে বেরিয়ে যেতে সাহায্য করা। (ঙ) শ্বেত রক্তকণিকাগুলির সাহায্যে রক্তের মধ্যে ক্ষতিকারক পদার্থ ও রোগ বীজাণু ধ্বংস করা। (চ) অণুচক্রিকাগুলির সাহায্যে রক্ত জমাট বাঁধার কাজ নিষ্পন্ন করা।

ধমনী, শিরা ও জালক ঃ রক্ত হৃৎপিণ্ড থেকে কতকগুলি রক্তবাহ নালীপথে দেহের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। এই নালীগুলি শাখায়-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে শেষ প্রান্তগুলি সূক্ষ্ম জালকের আকার

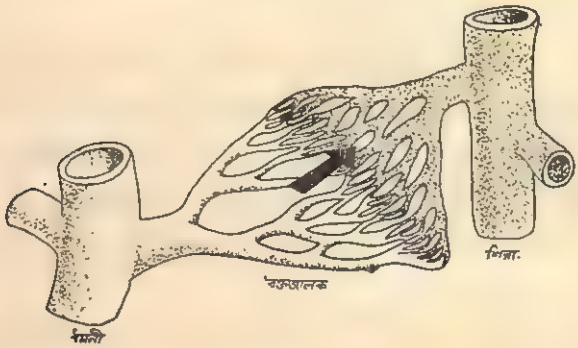

ধমনী, রক্তজালক ও শিরা

ধারণ করে। **এই জালক বা কৈশিক নালীগুলির (Capillaries)** আকার চুলের থেকেও সরু এবং এদের দেওয়াল খুবই পাতলা। এই পাতলা দেওয়াল ভেদ করে রক্ত থেকে গ্যাস ও সরল খাদ্যকণিকার আদান-প্রদান ঘটে দেহের প্রতিটি কোষের সঙ্গে। তারপর ঐ রক্ত সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে জালক ও রক্তবাহ নালী দিয়ে হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে। হৃৎপিণ্ড থেকে যে নালীপথে রক্ত কোষকলায় পৌঁছায় তাকে **ধমনী** (Artery) বলে। ধমনীর মধ্য দিয়ে অক্সিজেনযুক্ত বিশুদ্ধ রক্ত প্রবাহিত হয়। যে নালীপথে কার্বন ডাইঅক্সাইডযুক্ত দূষিত রক্ত জালক থেকে হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে তাকে **শিরা** (Vein) বলে। ধমনীর প্রাচীর শিরার থেকে মোটা, তাই ভেতরের গহ্বরের ব্যাস শিরা থেকে ছোট। শিরার মধ্যে একমুখী কপাটিকা বা **ভাল্‌ব্** (Valve) আছে, যার জন্য রক্ত শিরার মধ্যে কেবল এক দিকে অর্থাৎ হৃৎপিণ্ডের দিকেই প্রবাহিত হয়। ধমনীর মধ্যে এই রকম কোন কপাটিকা নেই। হৃৎপিণ্ডের মধ্যেও এই রকম একমুখী কপাটিকা আছে, তার ফলে হৃৎপিণ্ডটি যখন পর্যায়ক্রমে সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হয়

তখন রক্ত হৃৎপিণ্ড থেকে নির্গত হয়ে ধমনী, জালক ও শিরার মধ্য দিয়ে আবার হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে। এইভাবে একই দিকে একটি চক্রাকার পথে রক্ত দিবারাত্রি নিয়ত আবর্তিত (Circulated) হয়ে থাকে, একেই রক্ত সঞ্চালন বলে। গ্যাস বিনিময়ের ফলে এবং কোষ

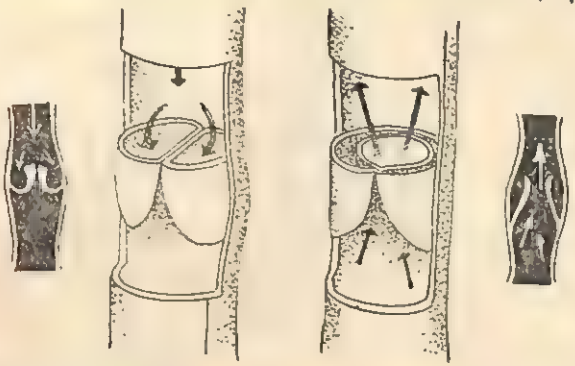

একমুখী কপাটিকার গঠন ও কার্যপ্রণালী

থেকে নানা দূষিত পদার্থ গ্রহণের ফলে জালকের মধ্যেই বিশুদ্ধ রক্ত দূষিত রক্তে রূপান্তরিত হয়, (ছবি দেখ)। ফুসফুসের সাহায্যে এবং রেচন তন্ত্রের সাহায্যে ঐ দূষিত রক্ত যথাক্রমে কার্বন ডাইঅক্সাইড ও রেচনজাত পদার্থ মোচন করে পুনরায় বিশুদ্ধ রক্তে পরিণত হয়।

হৃৎপিণ্ড: ব্যাঙের হৃৎপিণ্ডটি দেখতে ত্রিকোণাকার, এটি একটি পাতলা পর্দাদ্বারা ঢাকা থাকে, এই পর্দাটিকে পেরিকার্ডিয়াম বলে। এই পর্দাটি সরালে হৃৎপিণ্ডটি বেশ ভাল করে দেখা যায়। ব্যাঙের হৃৎপিণ্ডটি কয়েকটি কুঠুরী বা প্রকোষ্ঠ নিয়ে গঠিত, যেমন (1) সাইনাস ভেনোসাস, (2) ডান অলিন্দ, (3) বাম অলিন্দ, (4) নিলয়, (5)

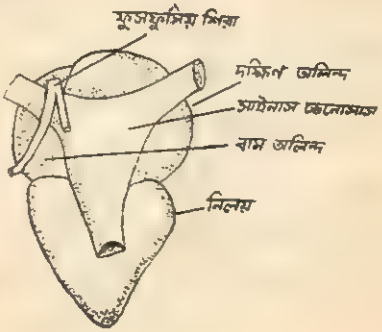

ব্যাঙের হৃৎপিণ্ড

কোনাস্ আর্টিরিওসাস্। বাস্তবিকপক্ষে ডান অলিন্দ, বাম অলিন্দ ও নিলয়ই হল আসল প্রকোষ্ঠ। সাইনাস ভেনোসাস এবং কোনাস্ আর্টিরিওসাস্ যথাক্রমে শিরা এবং ধমনীর সমন্বয়ে গঠিত।

হৃৎপিণ্ড একটি পাম্পের মত কাজ করে। আমরা পাম্পের সাহায্যে জল বা কোন তরল পদার্থ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সরবরাহ করে থাকি, হৃৎপিণ্ডটিও তেমনি দেহের সর্বত্র একটি চক্রাকার পথে রক্ত সঞ্চালিত করে থাকে। হৃৎপিণ্ডটি যখন পর্যায়ক্রমে সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হতে থাকে তখন রক্ত **নিলয়** নামক প্রকোষ্ঠটি থেকে **কোনাস্ আর্টিরিওসাস্ প্রকোষ্ঠে** আসে এবং তারপর মোটা **মহাধমনী** ও পরে শাখায়-প্রশাখায় বিভক্ত অসংখ্য ধমনীর মধ্য দিয়ে ঐ রক্ত দেহের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে এবং সবশেষে যখন অসংখ্য সূক্ষ্ম জালকের মধ্যে রক্ত পৌঁছায়, তখন গ্যাসের আদান-প্রদান ঘটে দেহকোষগুলির সঙ্গে, সে কথা আগেই বলা হয়েছে। **বিশুদ্ধ রক্ত এই প্রক্রিয়ার ফলে দূষিত হয়।** ঐ দূষিত রক্ত তারপর সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে জালক, শিরা ও **তিনটি মহাশিরার** মধ্য দিয়ে হৃৎপিণ্ডের **সাইনাস ভেনোসাস** নামক প্রকোষ্ঠে ফিরে আসে।

এখন তোমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, দূষিত রক্ত যা হৃৎপিণ্ডের মধ্যে ফিরে এল তা আবার বিশুদ্ধ রক্তে পরিণত হয় কি করে? **শ্বসন তন্ত্র** আলোচনার সময় আমরা জেনেছি, ব্যাঙের ফুসফুসের মধ্যে দূষিত রক্ত গ্যাস বিনিময়ের ফলে কিভাবে বিশুদ্ধ রক্তে পরিণত হয়। সুতরাং হৃৎপিণ্ড থেকে দূষিত রক্ত প্রথমে যায় ফুসফুসে বিশুদ্ধীকরণের জন্য, তারপর সেখানে গ্যাস বিনিময়ের ফলে রক্ত বিশুদ্ধ হলে ঐ বিশুদ্ধ রক্ত আবার হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে এবং দেহের অন্যান্য স্থানে তা আবার পরিবাহিত হয়। এইখানে মনে রাখা দরকার, ব্যাঙের বাম ও দক্ষিণ অলিন্দ একটি সাধারণ ছিদ্রপথে নিলয়ে মুক্ত হয়েছে। ব্যাঙের বাম অলিন্দে যখন ফুসফুস থেকে বিশুদ্ধ অক্সিজেনযুক্ত রক্ত প্রবেশ করে, ঠিক ঐ সময়ই ব্যাঙের দক্ষিণ অলিন্দে দেহের অন্যান্য কলা-

কোষ থেকে আগত দূষিত কার্বন ডাইঅক্সাইডযুক্ত রক্ত প্রবেশ করে। এই অলিন্দ দুটি সঙ্কোচনের ফলে ঐ বিশুদ্ধ এবং দূষিত রক্ত সাধারণ নালীপথে একই সময়ে নিলয়ের মধ্যে প্রবেশ করে ; তারপর ঐ রক্ত কোনাস্ আর্টিরিওসাস্, মহাধমনী ও অন্যান্য ধমনীর মাধ্যমে সারা দেহে পরিবাহিত হয়। সুতরাং, নিলয় ও কোনাস্ আর্টিরিওসাসের মধ্যে বিশুদ্ধ ও দূষিত রক্ত কিছুটা মিশ্রিত হয়ে যায়। ব্যাঙের দেহে এইভাবে মিশ্রিত রক্ত পরিবাহিত হয়।

রক্তের গতিপথ নিয়ন্ত্রণ করে কপাটিকা (Valve)। হৃৎপিণ্ড ও শিরায় অনেকগুলি কপাটিকা থাকায় রক্ত বিপরীত পথে প্রবাহিত হতে পারে না। অর্থাৎ একই চক্রাকার পথে বারংবার আবর্তিত হয়ে থাকে।

মানুষের দেহের রক্ত-সঞ্চালন তন্ত্রের মোটামুটি এই একই কাঠামো। মানুষের হৃৎপিণ্ডের **চারিটি** প্রকোষ্ঠ, যথা **দুটি অলিন্দ ও দুটি নিলয়।** বাম নিলয় থেকে বিশুদ্ধ রক্ত দেহে সঞ্চালিত হয় এবং দূষিত রক্ত দক্ষিণ অলিন্দে ফিরে আসে এবং তা ফুসফুসের সাহায্যে বিশোধিত হয়ে পুনরায় নিলয়ে যায়। মানুষের হৃৎপিণ্ডে দুইটি নিলয় থাকায় এবং তাদের মধ্যে কোন সংযোগ না থাকায় মানুষের হৃৎপিণ্ডের মধ্যে ব্যাঙের মত বিশুদ্ধ ও দূষিত রক্তের কোন মিশ্রণ ঘটে না।

রেচন তন্ত্র (Excretory system) ঃ কুনো ব্যাঙের রেচন তন্ত্রের প্রধান অঙ্গ হল বৃক্ক বা কিডনী। ব্যাঙের বৃক্কদুটি লম্বাটে ধরনের, গাঢ় বাদামী রঙের ও মেরুদণ্ডের দুই পাশে অবস্থিত। প্রতিটি বৃক্ক থেকে একটি করে **ইউরেটার** নামক নালী বেরিয়েছে। ইউরেটার দুটি পরে একসঙ্গে মিলিত হয়ে একটি সাধারণ নালীতে পরিণত হয়েছে এবং তা **অবসারণীর** মধ্যে মুক্ত হয়েছে। অবসারণীর অঙ্কীয় দেশেই **মূত্রাশয়** আছে। মূত্রাশয়ে মূত্র সাময়িকভাবে জমা থাকে, পরে তা অবসারণীর ছিদ্রপথ দিয়ে বাইরে নির্গত হয়।

বৃক্কের মধ্যে মূত্র তৈরী হয়। এই বৃক্ক পাতলা দেওয়ালবিশিষ্ট **অসংখ্য সূক্ষ্ম নালিকার** সমন্বয়ে গঠিত। ব্যাঙের রক্তবাহ শিরার

জালকের অংশ ঘনিষ্ঠভাবে এই বৃক্ক-নালিকার সঙ্গে যুক্ত, তার ফলে রক্ত থেকে জল, সরল খাদ্যকণা ও দূষিত পদার্থগুলি এই বৃক্ক-নালিকার মধ্যে সংগৃহীত হয়, কিন্তু অধিকাংশ জল ও খাদ্যকণাগুলি পুনরায় রক্তের মধ্যে শোষিত হয়, কেবল দূষিত পদার্থগুলি ও অতিরিক্ত জল ও লবণের অংশ মূত্ররূপে ইউরেটারের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হয়ে মূত্রাশয়ে জমা হয়। বৃক্ক প্রধানতঃ দুইটি কাজ করে, প্রথমতঃ রক্ত থেকে অতিরিক্ত জল, অপ্রয়োজনীয় লবণ ও নানা রকম দূষিত পদার্থ বার করে দিয়ে রক্তকে বিশোধিত করে। দ্বিতীয়তঃ বহু প্রয়োজনীয় পদার্থ পুনরায় শোষণ করে রক্তের উপাদানগুলি নির্দিষ্ট পরিমাণে রক্ষা করে।

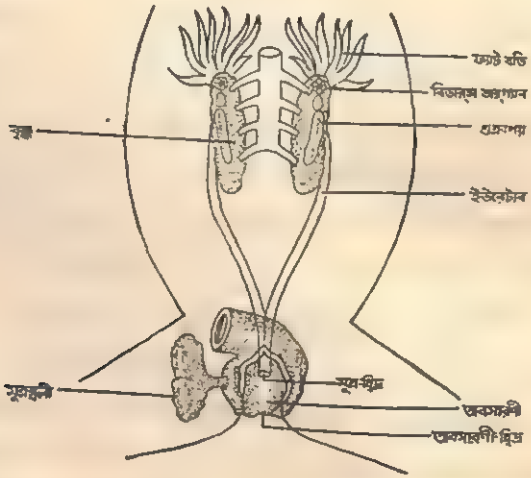

ব্যাঙের রেচন-জনন তন্ত্র

ব্যাঙের বৃক্কের অগ্রভাগে কতকগুলি ফ্যাট বডি থাকে, এতে ব্যাঙের সঞ্চিত খাদ্য থাকে। শীতকালে দীর্ঘ শীতঘুমের সময় এই খাদ্য তাদের কাজে লাগে। সঞ্চিত খাদ্যের পরিমাণ অনুযায়ী এই ফ্যাট বডির আকার ছোট বড় হয়।

মানুষের রেচন তন্ত্র মোটামুটি এই একই পদ্ধতিতে কাজ করে। মানুষের বৃক্কদুটি বাংলা ৫-এর মত এবং তা অসংখ্য বৃক্কনালী বা

নেফ্রনের সাহায্যে গঠিত। ব্যাঙের জনন তন্ত্র আলোচনার সময় দেখা যাবে, ব্যাঙের দেহে জনন তন্ত্র ও রেচন তন্ত্রের যোগ যত বেশী মানুষের তা নয়।

জনন তন্ত্র (Reproductive System) : ব্যাঙ আরশোলার মত একলিঙ্গ প্রাণী। পুরুষ ও স্ত্রী ব্যাঙ আলাদা। পুরুষ ব্যাঙের দেহে **পুংজনন তন্ত্র** ও স্ত্রী ব্যাঙের দেহে **স্ত্রীজনন তন্ত্র** আছে।

পুংজনন তন্ত্র : ব্যাঙের পুংজনন তন্ত্র এক জোড়া শুক্রাশয়, শুক্রনালী, এক জোড়া ইউরেটার ও অবসারণী ছিদ্র নিয়ে গঠিত। শুক্রাশয়দুটি লম্বা আকারের হাল্কা ও বাদামী রংএর এবং একটি পাতলা পর্দাদ্বারা এক-একটি বৃক্কের (কিডনী) সঙ্গে যুক্ত। শুক্রাশয়ে শুক্রাণু (Sperm) তৈরী হয়। এই শুক্রাণু কয়েকটি সূক্ষ্ম নালীদ্বারা বাহিত হয়ে বৃক্কনালীতে মুক্ত হয়, তার পর বৃক্কনালী থেকে শুক্রাণুগুলি ইউরেটারে প্রবেশ করে। পুরুষ ব্যাঙের ইউরেটার দুটি মূত্র ও শুক্রাণু বহন করে। পুরুষ ব্যাঙের ইউরেটারকে এইজন্য **রেচন-জনন নালী** (Urinogenital duct) বলে। ইউরেটার দুটি একটি সাধারণ নালীতে মিলিত হয়ে অবসারণীতে মুক্ত হয়েছে, শুক্রাণুগুলিও ঐ পথে অবসারণীর মাধ্যমে দেহের বাইরে নিক্ষিপ্ত হয়।

প্রতিটি শুক্রাশয়ের অগ্রভাগে একটি গোলাকার অঙ্গ দেখা যায়। একে **বিডার্স অঙ্গ** (Bidder's organ) বলে, ঐটি বস্তুতঃ একটি অপরিণত ডিম্বাশয়। কেবল পুরুষ ব্যাঙের এই বিডার্স অঙ্গ আছে।

স্ত্রীজনন তন্ত্র : ব্যাঙের স্ত্রীজনন তন্ত্র এক জোড়া ডিম্বাশয় (Ovary), এক জোড়া ডিম্বাশয় নালী, এক জোড়া ইউটেরাস্ ও জননছিদ্র নিয়ে গঠিত।

ডিম্বাশয় দুটি স্ফীত থলির মত, ডিম্বাশয়ের মধ্যে অসংখ্য ডিম্বাণু থাকে। প্রতিটি ডিম্বাশয়ের পাশে একটি করে ডিম্বাশয় নালী আছে। ডিম্বাশয় নালীটি স্প্রীং-এর মত পাকান এবং মুখটি

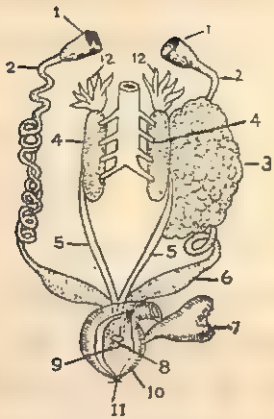

স্ত্রী ব্যাঙের রেচন-জনন তন্ত্র
1. ডিম্বাশয়-নালীর ফানেলের মত মুখ, 2. ডিম্বনালী, 3. ডিম্বাশয়, 4. বৃক্ক, 5. ইউরেটার, 6. ইউটেরাস, 7. মূত্রাশয়, 8. জননছিদ্র, 9. রেচনছিদ্র, 10. অবসারণী, 11. অবসারণী-ছিদ্র।

ফানেলের মত প্রসারিত। ডিম্বাশয় নালীর নীচের অংশ ইউটেরাস্, দুটি ইউটেরাস্ মিলিত হয়ে একটি সংযুক্ত নালীতে পরিণত হয়েছে এবং তা একটি ছিদ্রপথে অবসারণীতে মুক্ত হয়েছে। এই ছিদ্রটিকে জননছিদ্র বলা হয়। জননের সময় ডিম্বাশয় থেকে পরিণত ডিম্বাণুগুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে ব্যাঙের দেহগহ্বরের মধ্যে আসে এবং তার পর ডিম্বনালীর ফানেলের মত মুখ দিয়ে ইউটেরাসের মধ্যে প্রবেশ করে, সেখানে সাময়িকভাবে অবস্থান করবার পর জননছিদ্রপথে দেহের বাইরে নিষ্ক্রান্ত হয়। স্ত্রী ব্যাঙ জলের মধ্যে এইভাবে অসংখ্য ডিম্বাণু ছাড়ে। পুরুষ ব্যাঙও জলে শুক্রাণু ছাড়ে, একটি ডিম্বাণুর সঙ্গে একটি শুক্রাণুর মিলনের ফলে ভ্রূণাণুর সৃষ্টি হয়। এরই নাম জনন (Fertilization)। দেহের বাইরে ডিম্বাণুর সঙ্গে শুক্রাণুর এই সংযোগ হয় বলে একে বলা হয় দেহের বাইরে জনন (External fertilization)। ঐ ভ্রূণাণু থেকে ব্যাঙাচির সৃষ্টি হয়। ব্যাঙাচি রূপান্তরিত হয়ে ব্যাঙে পরিণত হয়।

অনুশীলনী

1. আরশোলার পৌষ্টিক তন্ত্র কি কি প্রধান অঙ্গের সাহায্যে গঠিত? আরশোলার পৌষ্টিক নালীর একটি ছবি আঁক এবং তার বিভিন্ন অংশ লেবেল কর।

2. আরশোলার রক্ত ও রক্তসংবহন ও শ্বসন সম্পর্কে যা জান সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
3. আরশোলার জনন তন্ত্র সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
4. রেচন বলতে কি বোঝ? একটি অমেরুদণ্ডী প্রাণীর রেচন পদ্ধতি বর্ণনা কর।
5. ব্যাঙ কত রকমে শ্বাসকার্য করে? শ্বাসকার্যের উদ্দেশ্য কি? ব্যাঙের ফুসফুস সম্পর্কে যা জান লেখ।
6. ব্যাঙের রক্ত ও তার কার্য সম্পর্কে যা জান লেখ।
7. ব্যাঙের হৃৎপিণ্ডের গঠন ও তার কার্য সম্পর্কে যা জান লেখ।
8. পুরুষ ব্যাঙের রেচন-জনন তন্ত্রের একটি ছবি আঁক ও তার বিভিন্ন অংশের নাম লেখ।
9. বহিঃকঙ্কাল ও অন্তঃকঙ্কাল প্রাণী কাকে বলে? একটি করে উদাহরণ দাও। ব্যাঙের মেরুদণ্ডের একটি ছবি আঁক ও তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
10. টীকা লেখ:

    হিমোগ্লোবিন, ম্যালপিজিয়ান নালিকা, আরশোলার হৃৎপিণ্ড, নেফ্রিডিয়াম, কশেরুকা, ডিওডিনাম, অ্যালভিওলাই, অগ্ন্যাশয়, যকৃৎ, গিজার্ড।

INSTITUTE OF EDUCATION FOR WOMEN. Deptt of Extension CALCUTTA-27

পঞ্চম অধ্যায়

আগের অধ্যায়গুলিতে উদ্ভিদ, কেঁচো, আরশোলা ও ব্যাঙ প্রভৃতি জীবের আভ্যন্তরিক গঠন ও বিভিন্ন তন্ত্র (System) সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ঐ সকল তন্ত্র নানা প্রকার শারীরবৃত্তীয় কাজ করে থাকে। এই সকল শারীরবৃত্তীয় কাজ আবার নিষ্পন্ন হয় কতকগুলি ভৌত ও রাসায়নিক বিক্রিয়ার সাহায্যে। এখানে কয়েকটি ভৌত ও শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়ার বিবরণ দেওয়া হল।

ব্যাপন
(Diffusion)

আতর বা সেন্টের শিশি যখন খোলা হয় তখন তার সুগন্ধ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ঐ গন্ধের তীব্রতা শিশির মুখের কাছেই বেশী, শিশির কাছ থেকে যতই দূরে সরে যাওয়া যায় ততই গন্ধের তীব্রতা কমে আসে। এক গ্লাস জলে যদি একখণ্ড তুঁতে রাখা হয়, তাহলে দেখা যাবে তুঁতেটি ধীরে ধীরে গলে যাচ্ছে এবং গ্লাসের জলের মধ্যে তুঁতের নীল রং ক্রমশঃ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। এক্ষেত্রেও দেখা যাবে নীল রং-এর ঘনত্ব তুঁতের কাছাকাছি জলেই বেশী, তারপর ঐ রং ক্রমশঃ পাতলা হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। অনেকক্ষণ যদি অপেক্ষা করা যায় তাহলে দেখা যাবে গ্লাসের সব জলটাই সমানভাবে নীলবর্ণ ধারণ করেছে। এদুটি ক্ষেত্রেই মূল প্রক্রিয়াটির স্বরূপ এক। পদার্থের সূক্ষ্ম অণুগুলি বেশী ঘনত্ব থেকে অল্প ঘনত্বের দিকে ধাবিত হওয়ার ফলেই এটা ঘটে, একেই বলা হয় ব্যাপন বা Diffusion ; সেন্টের মত উদ্বায়ী (Volatile) পদার্থ

*পদার্থের যে ক্ষুদ্রতম কণা পদার্থের ধর্ম বজায় রেখেও স্বতন্ত্রভাবে থাকতে পারে তাকে অণু (Molecule) বলে।

স্পিরিট, পেট্রোল, কর্পূর বা ন্যাপথালিনের সূক্ষ্ম অণুগুলিও ঐ একই নিয়মে অর্থাৎ ব্যাপনক্রিয়ায় চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে, তাই তাদের গন্ধ দূর থেকেই পাওয়া যায়।

তুঁতের মত চিনির দানাও যখন জলের মধ্যে ফেলা হয় তখন তার মিষ্টত্ব ক্রমশঃ সমস্ত জলে ছড়িয়ে পড়ে। চিনির সূক্ষ্ম অণুগুলি অধিক ঘনত্ব থেকে অল্প ঘনত্বের দিকে ছড়িয়ে পড়ার ফলেই এটা ঘটে। যতক্ষণ ঘনত্বের অসাম্য থাকে ততক্ষণ ব্যাপনক্রিয়া ঘটে। সমান অবস্থা এলেই, অর্থাৎ সমস্ত জল সমঘনত্বপূর্ণ হলেই ব্যাপন বন্ধ হয়ে যায়।

উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবনে এই ব্যাপনক্রিয়ার গুরুত্ব খুবই বেশী। বহু রকম শারীরবৃত্তীয় কাজে এই ব্যাপনক্রিয়ায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। যেমন উদ্ভিদ ও প্রাণিকোষের মধ্যে জল, অক্সিজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড ও জৈব ও অজৈব পদার্থের প্রবেশ, নির্গমন ও কোষের মধ্যে ঐ সকল পদার্থের ব্যাপ্তি ইত্যাদি যা ঘটে তা এই ব্যাপনক্রিয়ার সাহায্যেই ঘটে থাকে। সুতরাং উদ্ভিদ ও প্রাণীর শ্বাসকার্য, পরিপাক ক্রিয়া, রেচন, জনন এবং উদ্ভিদের শিকড়ের সাহায্যে জল শোষণ, বাষ্পমোচন, সালোকসংশ্লেষ প্রভৃতি প্রায় সকল শারীরবৃত্তীয় কাজেই ব্যাপনক্রিয়ার ভূমিকা আছে।

অভিস্রবণ
(Osmosis)

ব্যাপনক্রিয়ার সময় আমরা দেখেছি, পদার্থের সূক্ষ্ম অণুগুলি অধিক ঘনত্ব থেকে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এই কারণে চিনির দানা বা চিনির রস যখন জলের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয় তখন সমস্ত জলই ধীরে ধীরে মিষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু ঐ চিনির রস সরাসরি জলে না মিশিয়ে যদি একটি কাঁচের থিসিল ফানেলের মধ্যে রাখা হয় এবং ফানেলের মুখে একটি পার্চমেণ্ট পেপার বা মাছের পটকার পাতলা পর্দা বেঁধে ঐ ফানেলের মুখটি জলের মধ্যে রাখা হয় (ছবি দেখ),

তা হলে দেখা যাবে ঐ চিনির সূক্ষ্ম অংশগুলি জলের মধ্যে ছড়িয়ে না পড়ে জলের অংশই থিসিল ফানেলের মধ্যে ঢুকছে, যার ফলে ফানেলের মধ্যে জলের ভাগ ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে এবং চিনির রস ক্রমশঃ তরল হয়ে পড়ছে। ফানেলের মধ্যে কতটা জল ঢুকল তা সহজেই জানা যেতে পারে ফানেলের গায়ে যদি আগে থেকে

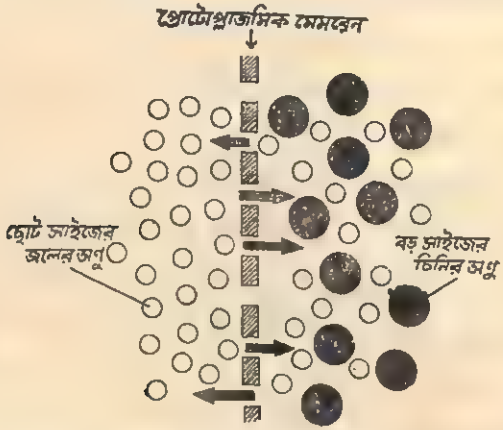

অর্ধভেদ্য পর্দার (প্রোটোপ্লাজমিক মেমব্রেন) মধ্য দিয়ে বড় সাইজের অণুগুলি পার হতে পারে না, কিন্তু ছোট সাইজের অণুগুলি অনায়াসে পার হয়ে যায়।

একটি চিহ্ন দিয়ে রাখা হয়,—চিনির রস যতটা নেওয়া হয়েছিল তার তল অনুযায়ী। এটিও এক বিশেষ ধরনের ব্যাপনক্রিয়া। এখানে একটি বিশেষ ধরনের পাতলা পর্দা ভেদ করে জল বা দ্রাবকের (Solvent) অণু অপেক্ষাকৃত ঘন দ্রবণের (Solution) মধ্যে প্রবেশ করছে, এটাই হল অভিস্রবণ বা অসমোসিসের (Osmosis) বৈশিষ্ট্য। অভিস্রবণ ক্রিয়ায় এই বিশেষ ধরনের পাতলা পর্দার ভূমিকা খুবই উল্লেখযোগ্য। পর্দা তিন ধরনের হতে পারে, এক হল অভেদ্য (Impermeable) পর্দা, যার মধ্য দিয়ে কোন পদার্থের অণুই যাতায়াত করতে পারে না ; দুই হল ভেদ্য (Permeable) পর্দা, যার মধ্য দিয়ে

সকল পদার্থের অণুই অনায়াসে যাতায়াত করে থাকে। তিন হল, অর্ধভেদ্য (Semipermeable) পর্দা, যার মধ্য দিয়ে জল বা ঐ জাতীয় দ্রাবকের সূক্ষ্ম অণুগুলিই কেবল যাতায়াত করতে পারে, কিন্তু চিনি বা চিনির মত পদার্থের বড় সাইজের অণুগুলি পর্দার সূক্ষ্ম গর্ত দিয়ে আদৌ পার হতে পারে না। উদ্ভিদ ও প্রাণীর প্রতিটি জীবকোষের প্রোটোপ্লাজমিক মেমব্রেন এই জাতীয় অর্ধভেদ্য পর্দার (Semipermeable membrane) সাহায্যে তৈরী।

থিসিল ফানেলের মুখে যে পার্চমেণ্ট পেপার বা মাছের পটকার পর্দা লাগান হয়েছে তা ঐ জাতীয় অভেদ্য পর্দা, যার মধ্য দিয়ে বড় সাইজের চিনির অণুর পার হবার কোনই সম্ভাবনা নেই, কিন্তু ঐ পর্দা ভেদ করে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র সাইজের জলের অণুর যাতায়াতের কোনই বাধা নেই। তাই ফানেলের মধ্যস্থিত চিনির দ্রবণ থেকে কোন চিনি ঐ পর্দা ভেদ করে পাত্রের জলে গিয়ে মিশ্রিত হয়নি, কিন্তু পাত্রের জল ঐ পর্দা ভেদ করে চিনির দ্রবণের সঙ্গে মিশ্রিত হয়েছে। চিনির দ্রবণ থেকেও অবশ্য কিছু জলের অণু পাত্রের জলে মিশ্রিত হয়েছে তবে তার পরিমাণ তুলনায় খুবই সামান্য (পূর্বপৃষ্ঠার ছবি দেখ)। পাত্রে বিশুদ্ধ জলের পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত অল্প ঘনত্বযুক্ত চিনির দ্রবণ নিলেও ফলাফল একই হত।

অভিস্রবণ বা অসমোসিস ক্রিয়াটিকে তাই সংক্ষেপে বলা যায়,—দুইটি বিভিন্ন ঘনত্বযুক্ত দ্রবণ (Solution) যখন একটি অর্ধভেদ্য পর্দার (Semipermeable membrane) দ্বারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন থাকে তখন কম ঘনত্বপূর্ণ দ্রবণ থেকে জল বা দ্রাবক (Solvent) ঐ পর্দা ভেদ করে অধিক ঘনত্বপূর্ণ দ্রবণের সঙ্গে মিশ্রিত হতে থাকে, তার ফলে অধিক ঘনত্বপূর্ণ দ্রবণের মধ্যে জলের বা দ্রাবকের ভাগ বাড়তে থাকে এবং তার ঘনত্ব ধীরে ধীরে কমতে থাকে এবং অন্য দিকে অল্প ঘনত্বপূর্ণ দ্রবণের মধ্যে জলের ভাগ ক্রমশঃ কমতে থাকে এবং তার ঘনত্ব ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে ; এবং যতক্ষণ না পর্দার দুই পাশে দুইটি দ্রবণের

ঘনত্ব একই মাত্রায় পৌঁছচ্ছে ততক্ষণ এই ক্রিয়া চলতে থাকে। অভিস্রবণ ক্রিয়ার সময় জল বা দ্রাবক যখন অর্ধভেদ্য পর্দা অতিক্রম করে অধিক ঘনত্বযুক্ত দ্রবণের মধ্যে প্রবেশ করতে থাকে তখন সেখানে একটি বিশেষ ধরনের চাপের (Pressure) সৃষ্টি হয়, তাকে বলে **অসমোটিক প্রেসার** (Osmotic pressure)।

অভিস্রবণ বা অসমোসিস প্রক্রিয়াটি নিম্নলিখিত পরীক্ষার সাহায্যে দেখান যেতে পারে।

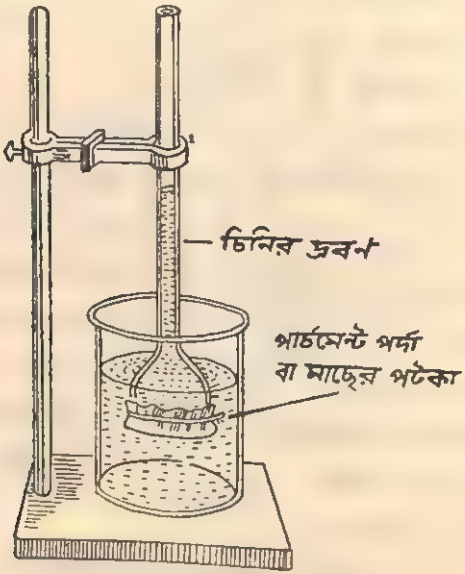

অসমোসিস পরীক্ষার চিত্র

পরীক্ষা ঃ একটি কাঁচের থিসিল ফানেলের মুখে মাছের পটকার একটি পর্দা অথবা পার্চমেন্ট পেপার ভাল করে বেঁধে নাও, থিসিল ফানেলের সরু মুখ দিয়ে অধিক ঘনত্বযুক্ত চিনির দ্রবণ (10% চিনির দ্রবণ) ফানেলের মধ্যে ভর্তি কর এবং যতটা ভর্তি হল তার তল ফানেলের গায়ে দাগ দিয়ে চিহ্নিত করে রাখ। একটি বীকারে আগে থেকেই অল্প ঘনত্বযুক্ত একটি চিনির দ্রবণ (1% চিনির দ্রবণ) প্রস্তুত করে রাখ এবং অবিলম্বে থিসিল ফানেলের পর্দা-ঢাকা প্রশস্ত মুখটি

বীকারের দ্রবণের মধ্যে নিমজ্জিত কর। (থিসিল ফানেলের মধ্যে যতটা চিনির দ্রবণ নেওয়া হয়েছে ততদূর অবধি যেন ফানেলটি বীকারের দ্রবণের মধ্যে নিমজ্জিত হয় অর্থাৎ ঐ বীকার ও ফানেলের মধ্যস্থিত দ্রবণ যেন একই তলে থাকে।)

কিছুক্ষণ পরেই দেখা যাবে থিসিল ফানেলের গায়ের চিহ্নটি ছাড়িয়ে ফানেলের মধ্যস্থিত দ্রবণের তল ক্রমশঃ ওপরের দিকে উঠে যাচ্ছে, তার অর্থ হল বীকারের জল ক্রমশঃ ফানেলের মধ্যে প্রবেশ করছে। এই ফানেলের সরু মুখের মাথায় যদি চাপ নির্দেশক কোন যন্ত্র (মারকারি ম্যানোমিটার) বসিয়ে রাখা যায় তা হলে দেখা যাবে ঐ দ্রবণের মধ্যে একটি বিশেষ চাপ সৃষ্টি হচ্ছে, একেই বলে **অসমোটিক প্রেসার** (Osmotic pressure)। বাইরে থেকে জলের অণুগুলি জোর করে অধিক ঘনত্বপূর্ণ দ্রবণের মধ্যে প্রবেশ করতে চেষ্টা করছে বলেই এই চাপের সৃষ্টি হচ্ছে। দুইটি দ্রবণের মধ্যে ঘনত্বের পার্থক্য যত বেশী হবে, চাপের মাত্রা তত বেশী হবে। অভিস্রবণ ক্রিয়া চলবার সময় এই চাপের মাত্রা ধীরে ধীরে কমতে থাকে, কেননা জলের অণুর প্রবেশের ফলে দুইটি দ্রবণের মধ্যে ঘনত্বের পার্থক্যও কমতে থাকে, শেষে দুইটি দ্রবণের ঘনত্বের মাত্রা যখন একই পর্যায়ে উপনীত হয় তখন অভিস্রবণ ক্রিয়াও বন্ধ হয়ে যায়।

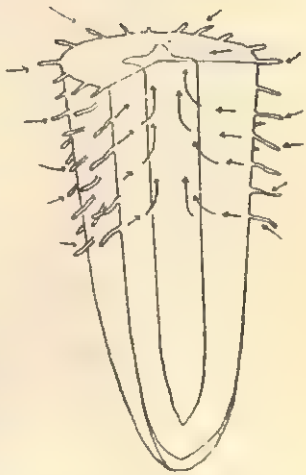

মূলরোমের মধ্য দিয়ে উদ্ভিদ-মূলের জল শোষণ।

কি উদ্ভিদ, কি প্রাণী সকলেরই নানা শারীরবৃত্তীয় কার্যে এই অভিস্রবণ বা অসমোসিসের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কেননা প্রত্যেকটি জীবকোষের প্রোটোপ্লাজমিক মেমব্রেন এই ধরনের অর্ধভেদ্য পর্দার সাহায্যে তৈরী। উদ্ভিদের শিকড়ের মূলরোমের কোষের মধ্যে

অধিক ঘনত্বযুক্ত কোষরস (Cell sap) থাকে এবং তার চারপাশে অর্ধভেদ্য পর্দার আবরণ থাকায় ঐ মূলরোম যখন মাটির ভেতর জলীয় দ্রবণের সংস্পর্শে আসে (যার ঘনত্ব প্রায় সব সময়ই কোষরসের ঘনত্ব থেকে কম) তখন ঐ জলীয় দ্রবণ থেকে জলের ভাগ অসমোসিস্ প্রক্রিয়ায় মূলরোমের মধ্যে প্রবেশ করে। এই একই প্রক্রিয়ায় কোষ থেকে কোষান্তরে জলের পরিবহন ঘটে থাকে। **এই একই প্রক্রিয়ায় সঞ্চিত জল কোষের বাইরেও বেরিয়ে যেতে পারে, যদি কোষগুলি অধিক ঘনত্বযুক্ত দ্রবণের মধ্যে নিমজ্জিত হয়,—একে প্লাজমোলিসিস (Plasmolysis) বলে।**

অসমোসিস প্রক্রিয়ায় কিভাবে উদ্ভিদের মধ্যে জল প্রবেশ করে এবং জল বাইরে বেরিয়ে যায় তা একটি সহজ পরীক্ষা করে দেখান যায়। একটি শুকনো কিসমিসকে যদি জলের মধ্যে রাখা যায় তা হলে কয়েক

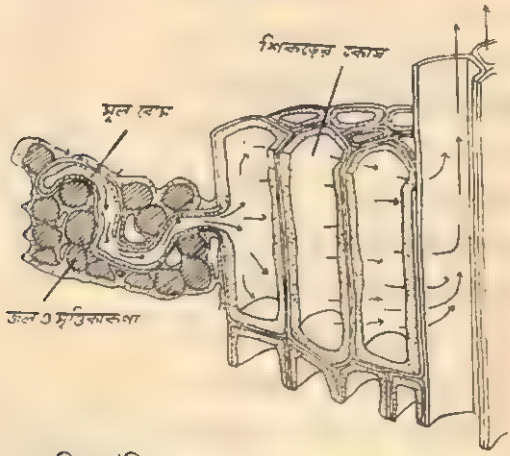

অসমোসিস প্রক্রিয়ায় মূলরোম ও শিকড়ের কোষের মধ্য দিয়ে মৃত্তিকাস্থ জল শোষিত হয়।

ঘণ্টার মধ্যেই দেখা যাবে তা ফুলে উঠে আঙুরের আকার ধারণ করেছে। একটি কচি আঙুরকে যদি আবার আরো অধিক ঘনত্বপূর্ণ চিনির দ্রবণের মধ্যে রাখা যায় তা হলে তার মধ্য থেকে জল বেরিয়ে

আসবে এবং আঙুরটি সঙ্কুচিত হয়ে কিসমিসের আকার ধারণ করবে। **চিনির মিঠাই-এর ওপর তাই জীবাণুরা সহজে বংশ বিস্তার করতে পারে না, ঐ চিনি জীবাণু-কোষ থেকে জল টেনে নেয়, জীবাণুদের মৃত্যু ঘটে।** বিজ্ঞানীদের অসমোসিস ক্রিয়া আবিষ্কারের বহু পূর্ব থেকেই আমরা ব্যবহারিক জীবনে জীবাণুদের হাত থেকে ফল ইত্যাদি সংরক্ষণের কাজে ঘন চিনির দ্রবণ ব্যবহার করে আসছি।

শোষণ
(Absorption)

উদ্ভিদ শিকড়ের সাহায্যে মাটি থেকে অসমোসিস প্রক্রিয়ায় জল শোষণ করে থাকে একথা আগেই আমরা জেনেছি। জীবকোষকে বেঁচে থাকতে হলে পরিবেশ থেকে প্রচুর জল, লবণ, অক্সিজেন ও খাদ্যকণিকা শোষণ করতে হয়। শোষণ কথাটির অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। জীবকোষের শতকরা 70-80 ভাগই জল, এই জল কোষের নানা কাজে প্রচুর ব্যয় হয়ে থাকে, সুতরাং এ ব্যয় পূরণের জন্য জীবকোষকে প্রচুর জল শোষণ করতে হয়। **সক্রিয় জীবকোষ মাত্রই জলের সংস্পর্শে এলে জল শোষণ করে।** উচ্চ শ্রেণীর উদ্ভিদ সাধারণতঃ শিকড়ের সাহায্যে জল শোষণ করে, তা ছাড়া কিছু পরিমাণ জল পাতা ও কুঁড়ির সাহায্যেও শোষিত হয়, শুকনো বীজও প্রচুর জল শোষণ করে থাকে। আমরা অন্ত্রের ভেতরের কোষের সাহায্যে জল ও খাদ্যকণিকা শোষণ করে থাকি। অনেক জীব সারা দেহ দিয়েই জল শোষণ করে, যেমন অ্যামিবা, শেওলা ইত্যাদি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অসমোসিস ক্রিয়ার সাহায্যেই এই জল কোষের মধ্যে প্রবেশ করে থাকে। ঐ জলের সঙ্গে যে লবণ কোষের মধ্যে প্রবেশ করে তার শোষণের পদ্ধতিটি অবশ্য আরো জটিল ও স্বতন্ত্র। তবে সামান্য লবণ ব্যাপনক্রিয়ার ফলেই কোষের মধ্যে প্রবেশ করে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। নীচে দুটি পরীক্ষার বিবরণ দেওয়া হল, যার সাহায্যে প্রমাণ করা যায় উদ্ভিদ শিকড়ের সাহায্যে ও বীজের অঙ্কুরোদ্গমের সময় জল শোষণ করে থাকে।

পরীক্ষা 1. দুটি কাঁচের কনিকাল ফ্লাস্ক নাও এবং তাদের গলা অবধি জলপূর্ণ কর। একটি ফ্লাস্কের জলে শিকড়সমেত একটি ছোট চারাগাছ প্রবেশ করাও (ছবি দেখ) এবং জলের ওপর কয়েক ফোঁটা বাদাম বা সরিষার তেল দাও, এতে জলের বাষ্পীভবন বন্ধ হবে। কিছু তুলা নিয়ে ফ্লাস্কের মুখে ভালভাবে গুঁজে দাও যাতে গাছটি খাড়াভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। অন্য ফ্লাস্কের জলের ওপরও কয়েক ফোঁটা তেল দাও এবং মুখে তুলা গুঁজে দাও। দুটি ফ্লাস্কই জানলার ধারে রেখে দাও। পরদিন দেখবে যে ফ্লাস্কে গাছটি আছে তার জল অনেক কমে গেছে, কিন্তু যে ফ্লাস্কে গাছ নেই তার জল আদৌ কমেনি, এতেই বোঝা যাচ্ছে উদ্ভিদ জল শোষণ করে থাকে। পরীক্ষার সুরুতে এবং শেষে জলসমেত ফ্লাস্কগুলি যদি ওজন করা হয় তা হলে জানা যাবে ঠিক কতটা জল উদ্ভিদ শোষণ করেছে।

উদ্ভিদ কর্তৃক জলশোষণের পরীক্ষা

পরীক্ষা 2. কিছু শুকনো ছোলা (10 গ্রাম বা তার কাছাকাছি) বীক্ষণাগারের দাঁড়িপাল্লার সাহায্যে সঠিকভাবে ওজন কর, ওজনটি লিখে রাখ এবং ঐ ছোলাগুলি একটি ডিসের জলের মধ্যে ডুবিয়ে রাখ। পরদিন দেখবে ঐ ছোলাগুলি ফুলে উঠেছে। ছোলাগুলি তখন জল থেকে তুলে নিয়ে একটি ব্লটিং পেপারের ওপর রেখে তাদের গা থেকে অতিরিক্ত জল মুছে নিয়ে পুনরায় ওজন কর। দেখবে, ওজন অনেক বেড়ে গেছে, যতটা ওজন বাড়ল ততটা জলই ছোলাগুলি শোষণ করেছে। এই পরীক্ষার সাহায্যে বোঝা গেল, শুকনো বীজ জল শোষণ করে থাকে।

পরিবহন
(Conduction)

উদ্ভিদ বা প্রাণীর দেহ যদি একটি বা কয়েকটি মাত্র কোষ নিয়ে গঠিত হত তা হলে ব্যাপনক্রিয়ার (Diffusion) সাহায্যে এক কোষ

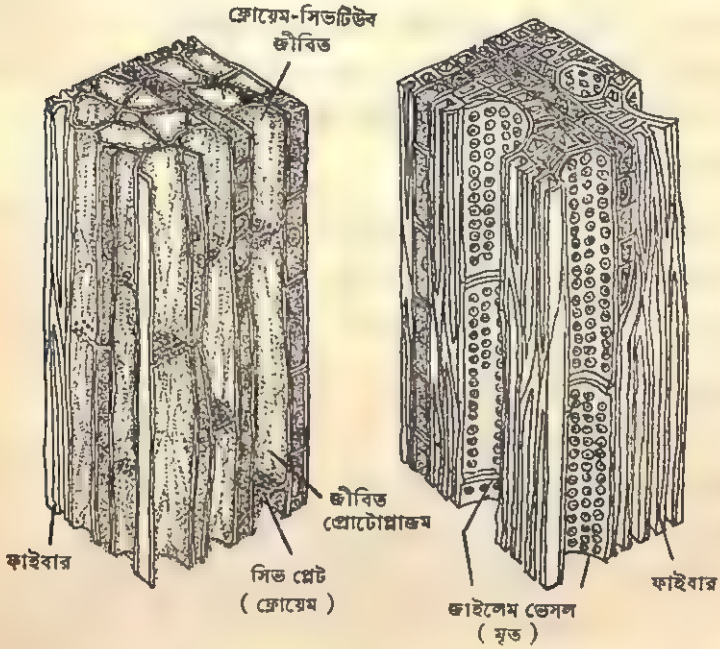

জল ও তরল খাদ্য পরিবহনের জন্য জাইলেম ও ফ্লোয়েম

হতে অন্য কোষে জল, লবণ ও সরল খাদ্যকণাগুলির যাতায়াতের কোনই অসুবিধা হত না, যেমন নানা রকম ব্যাকটিরিয়া, শেওলা ও ছত্রাকজাতীয় উদ্ভিদের দেহে ঘটে থাকে, কিন্তু উদ্ভিদ বা প্রাণিদেহের আকার যখন বেশ বড় ও জটিল হয় তখন দেহের বিভিন্ন কোষে জল, অক্সিজেন ও খাদ্যবস্তু দ্রুত ও নিয়মিতভাবে পৌঁছে দেবার জন্য একটা স্বতন্ত্র পরিবহন ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়। উন্নত শ্রেণীর উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহে এই ব্যবস্থা আছে।

উদ্ভিদঃ আমরা বট, অশ্বত্থ, তাল, নারিকেল প্রভৃতি যে-সব বৃক্ষ দেখি, সাধারণ যে-কোন প্রাণী অপেক্ষা তারা আকারে অনেক দীর্ঘ। একটি তিন-চার তলা সমান উঁচু নারিকেল গাছের মাথার ওপর জল কিভাবে পৌঁছায় এবং কিভাবে পাতার মধ্যে তৈরী জৈব খাদ্যই বা শিকড় ও দেহের সর্বত্র পৌঁছায় তার প্রকৃত রহস্য আজও উদ্ঘাটিত হয়নি। প্রাণিদেহের মত উদ্ভিদ-দেহে একটি হৃৎপিণ্ড (Heart) বা পাম্পের কোন অস্তিত্ব নেই এবং এই পাম্প না থাকা সত্ত্বেও প্রচুর পরিমাণ জল ও খাদ্যবস্তু উদ্ভিদ-দেহের মধ্যে 30-40 মিটার দূরত্ব পর্যন্ত স্বচ্ছন্দে যাতায়াত করে থাকে।

আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে উদ্ভিদের কলাসংস্থান সম্পর্কে আলোচনা করবার সময় জেনেছি, উচ্চ শ্রেণীর উদ্ভিদের দেহে জাইলেম (Xylem) ও ফ্লোয়েম (Phloem) নামে দুই ধরনের নালী বা টিউব আছে। জাইলেম নালীটি প্রধানতঃ ভেসেল (Vessel) নামে এক ধরনের পুরু প্রাচীরযুক্ত লম্বা আকারের মৃত কোষের দ্বারা গঠিত। জাইলেম নালীর কাজ হল মাটি থেকে জল ও জলের সঙ্গে দ্রবীভূত অবস্থায় মাটির নানা অজৈব লবণ (সার পদার্থ) দেহের অন্যান্য অংশে পৌঁছে দেওয়া। ফ্লোয়েম নালীটি প্রধানতঃ সিভ টিউব (Sieve tube) নামে এক ধরনের লম্বা আকারের কোষের সাহায্যে গঠিত। ফ্লোয়েমের কাজ হল পাতার মধ্যে তৈরী জৈব খাদ্য দেহের অন্যান্য অংশে পৌঁছে দেওয়া। উদ্ভিদ-দেহের যে-সমস্ত অংশে খাদ্য সঞ্চিত থাকে, যেমন মাটির তলায় কাণ্ড, শিকড় ইত্যাদি—সেখান থেকেও ঐ খাদ্য ফ্লোয়েমের মধ্য দিয়ে দেহের অন্যান্য জীবিত কোষগুলিতে পৌঁছায়। ফ্লোয়েমের

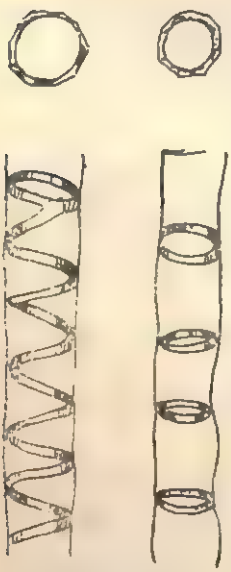

জাইলেম নালীর গঠন

মূল উপাদান সিভ টিউবগুলি জীবিত, জাইলেম ভেসেলগুলি মৃত।

প্রাণী: উন্নত শ্রেণীর প্রাণিদেহের বিভিন্ন কোষে জল, খাদ্য ও অক্সিজেন সরবরাহের জন্য এবং ঐ সকল কোষ থেকে বিপাকক্রিয়ায়

দোপাটির চারা লাল রং-মিশ্রিত জলে রাখা হয়েছে।

উৎপন্ন নানা দূষিত পদার্থ মোচনের জন্য সংবহন তন্ত্রের ব্যবস্থা আছে। এই সংবহন তন্ত্র হৃৎপিণ্ড, রক্ত, শিরা, ধমনী ও রক্তজালক নিয়ে

লাল রং-মিশ্রিত জলে দোপাটির পাতা ও কাণ্ড

গঠিত। এই সংবহন তন্ত্রের আলোচনা তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে

বিস্তৃতভাবে করা হয়েছে। নিম্নলিখিত পরীক্ষার সাহায্যে উদ্ভিদের জাইলেম টিস্যুর মধ্য দিয়ে জল পরিবাহিত হয় তা প্রমাণ করা যায়।

পরীক্ষা ঃ একটি পাত্রে জল নিয়ে তাতে কিছু ইয়োসিন রং অথবা লাল কালি মেশাও। তারপর মূলসমেত একটি দোপাটি ফুলের চারা, মূল থেকে মাটি পরিষ্কার করে ধুয়ে, ঐ জলপূর্ণ পাত্রে খাড়া করে দাঁড় করিয়ে রাখ। কয়েক ঘণ্টা পরে মূল, কাণ্ড ও পাতার প্রস্থচ্ছেদ নাও এবং অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করে দেখ। দ্বিতীয় অধ্যায় পড়বার সময় তোমাদের জাইলেম টিস্যুর সঙ্গে পরিচয় ঘটেছে। এখন লক্ষ্য কর, মূল, কাণ্ড ও পাতার জাইলেম অংশগুলিই কেবল লাল রং ধারণ করেছে। এতে প্রমাণিত হল, কেবল জাইলেম অংশের মধ্য দিয়েই উদ্ভিদ মাটি থেকে জল নিয়ে কাণ্ড ও পাতায় চালিত করে থাকে। এই ইয়োসিনমিশ্রিত লাল জলে যদি ফুলসমেত রজনীগন্ধার একটি ডাঁটি রাখ তা হলেও কয়েক ঘণ্টা পরে দেখা যাবে, রজনীগন্ধার সাদা ফুলগুলি লাল রং ধারণ করেছে। রজনীগন্ধার ডাঁটির প্রস্থচ্ছেদ নিয়ে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের তলায় পরীক্ষা করলে দেখা যাবে, তার জাইলেম অংশগুলির মধ্য দিয়েই লাল জল পরিবাহিত হয়েছে।

লাল রং-মিশ্রিত জলে রজনীগন্ধার ডাঁটা

প্রস্বেদন

(Transpiration)

উদ্ভিদের **প্রস্বেদন** (Transpiration) একটি উল্লেখযোগ্য শারীর-বৃত্তীয় ক্রিয়া। এই প্রস্বেদনের সময় প্রয়োজনের অতিরিক্ত জল যা উদ্ভিদ মাটি থেকে শোষণ করে তা বাষ্পাকারে পাতার অজস্র রন্ধ্রপথে (Stoma) দেহের বাইরে বার করে দেয়। উদ্ভিদ মাটি থেকে জলের সঙ্গে দ্রবীভূত অবস্থায় নানা রকম লবণ শোষণ করে পুষ্ট হয়, এজন্য প্রচুর জল তাকে শোষণ করতে হয়। অত জল তার কাজে

প্রস্বেদন পরীক্ষা

লাগে না, শরীরের মধ্যে তা জমিয়ে রাখবার মত কোন বিশেষ ব্যবস্থাও নেই ; তাই ঐ জল পাতার অজস্র সূক্ষ্ম রন্ধ্রের (Stoma) মধ্য দিয়ে বায়ুমণ্ডলে মোচন করে থাকে। পাতার রন্ধ্র ছাড়াও **ভিজা ত্বক** বা কিউটিকলের (Cuticle) মধ্য দিয়েও এই প্রস্বেদনক্রিয়া চলে।

প্রস্বেদনের জন্য উদ্ভিদের প্রচুর জলের প্রয়োজন হয়। সাধারণতঃ যখন উদ্ভিদের ওজন এক গ্রাম মাত্র বাড়ে তখন 300 থেকে 1000

গ্রাম জল উদ্ভিদ বাষ্পাকারে মোচন করে থাকে। তা হলে কল্পনা কর, একটি ধান বা গমের ক্ষেত থেকে কি বিপুল পরিমাণ সেচের জল এই প্রস্বেদনক্রিয়ায় অপচয় হয়ে থাকে। বৈজ্ঞানিকরা চেষ্টা করছেন, উদ্ভিদের এই প্রস্বেদনক্রিয়ার হার নিয়ন্ত্রণ করে জলের এই অপচয় কিছুটা বন্ধ করতে। উদ্ভিদের যাতে ক্ষতি না হয় সেটাও দেখা হচ্ছে, কেননা প্রস্বেদনক্রিয়ার ফলে উদ্ভিদের কয়েকটি সুবিধা হয়, যেমন মাটি থেকে জল ও লবণ শোষণের সুবিধা হয়, দেহ-কোষের মধ্যে নির্দিষ্ট ঘনত্বে কোষরস (Cell sap) রক্ষায় সুবিধা হয়, তাতে দেহের সর্বত্র জলের সংবহন সহজ হয়; ফুল ও ফলগুলির পরিপুষ্টির সুবিধা হয়। উদ্ভিদের প্রস্বেদনক্রিয়াটি নিম্নলিখিত পরীক্ষার সাহায্যে দেখান যেতে পারে।

পরীক্ষা ঃ একটি ছোট টবের তাজা চারা গাছ নাও, ঐ টবের মাটিতে অল্প জল দাও, তারপর একটি বড় পলিথিন কাগজের সাহায্যে পুরো টবটি ও টবের ওপরের মাটিটি ভাল করে ঢেকে ফেল এবং সূতা দিয়ে বাঁধ, যাতে কোন ফাঁক না থাকে। তারপর একটি আলোকিত স্থানে টবটি রেখে তার ওপর বেলজার চাপা দাও (ছবি দেখ)। কয়েক ঘণ্টা পরেই দেখবে বেলজারের ভেতরের গায়ে শিশিরের মত জলবিন্দু জমেছে। এ থেকে এটাই প্রমাণ হয় যে গাছ থেকেই ঐ জল বাষ্পাকারে নির্গত হয়ে বেলজারের গায়ে সঞ্চিত হয়েছে। টবের মাটি পলিথিন কাগজে ঢাকা ছিল, সুতরাং ঐ মাটি থেকে কোন জল বাষ্পাকারে নির্গত হয়ে বেলজারের গায়ে জমেনি।

অনুশীলনী

1. ব্যাপন বলতে যা বোঝ দুটি উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও। এই প্রক্রিয়াটির সঙ্গে উদ্ভিদ-জীবনের সম্পর্ক কি?
2. অসমোসিস বলতে কি বোঝ? চিত্রসহ অসমোসিসের একটি পরীক্ষা বর্ণনা কর। এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে উদ্ভিদ-জীবনের সম্পর্ক কি?

3. মূলদ্বারা উদ্ভিদের জল শোষণের একটি পরীক্ষা বর্ণনা কর।
4. পরিবহন পদ্ধতিটি কি? উদ্ভিদ-দেহে কি ধরনের নালিকা দ্বারা জল ও খাদ্যবস্তু পরিবাহিত হয়? উদ্ভিদ-দেহে জল পরিবহনের একটি সহজ পরীক্ষা বর্ণনা কর।
5. প্রস্বেদন কাকে বলে? প্রস্বেদনের একটি পরীক্ষা বর্ণনা কর। উদ্ভিদ-দেহে প্রস্বেদনের কি কোন প্রয়োজনীয়তা আছে?
6. টীকা লেখ:

   ব্যাপন, প্রস্বেদন, অভিস্রবণ, মূলরোম, অসমোটিক প্রেসার।

INSTITUTE OF EDUCATION FOR WOMEN
Deptt of Extension Services
CALCUTTA-27

ষষ্ঠ অধ্যায়

পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা

বিজ্ঞান শিক্ষার প্রথম ও প্রধান বিষয় হল নিজের চোখে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করা, নিজ হাতে বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখা এবং একটি যুক্তিসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। হাতে-কলমে পরীক্ষা ছাড়া বিজ্ঞান শিক্ষা সম্ভব নয়।

প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচিত কোষ ও কলা সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে হলে ঐগুলি নিজ চোখে পর্যবেক্ষণ করা দরকার। এজন্য অণুবীক্ষণ যন্ত্রটির গঠন ও ব্যবহার সম্পর্কে কিছু প্রাথমিক ধারণা থাকা দরকার। শিক্ষকমহাশয় এই বিষয়ে যথাযথ সাহায্য করবেন। তোমরা অণুবীক্ষণ যন্ত্রের একটি ছবি আঁকবে ও কেবলমাত্র প্রধান অংশগুলির লেবেল করবে। নীচু ও উঁচু ক্ষমতার অভিলক্ষ্য (Low power ও High power Objectives) কখন ও কিভাবে ব্যবহার করতে হয় তা শিখে নেবে। ছবি ও পর্যবেক্ষণের ফলাফল লেখবার জন্য একটি ব্যবহারিক খাতা রাখবে। তাতে পর্যবেক্ষণের তারিখ ও শিক্ষকমহাশয়ের সই যেন অবশ্যই থাকে।

উদ্ভিদের কাণ্ড, মূল ও পাতার প্রস্থচ্ছেদ ঃ কাণ্ড, মূল ও পাতার অন্তর্গঠন পরীক্ষা করে দেখতে হলে তাদের প্রস্থচ্ছেদ কাটা দরকার। প্রস্থচ্ছেদ যথাসম্ভব পাতলা হওয়া দরকার এবং সর্বাংশে সমান পাতলা হওয়া দরকার। ছেদ মোটা হলে তার মধ্য দিয়ে আলো যেতে পারে না, সুতরাং অণুবীক্ষণ যন্ত্রে তা দেখা যায় না। পাতলা ছেদ ভাল করে কাটা যথেষ্ট অভ্যাসের প্রয়োজন।

কাণ্ড বা মূলের প্রস্থচ্ছেদ কাটতে হলে তার নরম, কচি অংশ থেকে 3-4 সেন্টিমিটার লম্বা টুকরো নিয়ে একটি পাত্রে জলের মধ্যে ডুবিয়ে রাখতে হবে। তারপর একটি টুকুরো বাঁ হাতে খাড়া করে ধরে

ডান হাতে ক্ষুর দিয়ে প্রস্থচ্ছেদ কাটতে হবে। এজন্য একটি প্লেনো-কনকেভ (Plano-concave) ক্ষুর হলে ভাল হয়, তবে ব্লেডও

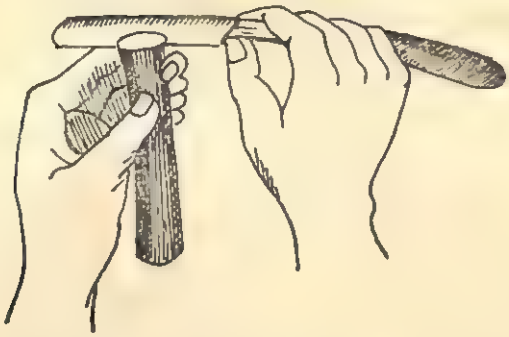

ক্ষুরের সাহায্যে কাণ্ডের প্রস্থচ্ছেদ কাটবার পদ্ধতি

ব্যবহার করা যায়। প্রস্থচ্ছেদ কাটবার সময় কাণ্ডের অংশ এমনভাবে ধরতে হবে যাতে বাঁ হাতের বুড়ো আঙ্গুল নিজের দিকে থাকে এবং অন্যান্য আঙ্গুলগুলি বিপরীত দিকে থাকে। এইবার তর্জনীর সামান্য উপরে ক্ষুরের সমতল পৃষ্ঠটি রেখে ক্ষুরটি দ্রুত চালিয়ে অনেকগুলি প্রস্থচ্ছেদ কাটতে হবে। ছেদগুলি ওয়াচ গ্লাসের জলের মধ্যে রাখতে হবে। এইবার একটি সর্বাংশে সমান পাতলা ছেদ একটি পরিষ্কার কাঁচের স্লাইডের মাঝখানে এক ফোঁটা জল অথবা 5% গ্লিসারিনের মধ্যে নিতে হবে এবং একটি কাঁচের কভার স্লিপ সাবধানে নীডলের সাহায্যে ছেদটির ওপর চাপা দিতে হবে। এই সময় লক্ষ্য রাখতে হবে, কোন বুদ্‌বুদ্‌ যেন তার মধ্যে না থাকে। স্লাইডের ওপর, কভার স্লিপের বাইরে অতিরিক্ত জল যা থাকবে তা ব্লটিং কাগজের সাহায্যে মুছে নিতে হবে এবং তারপর অণুবীক্ষণ যন্ত্রের তলায় স্লাইডটি পরীক্ষা করে দেখতে হবে। পরিশেষে ব্যবহারিক খাতায় তারিখসহ তার ছবি ও বিভিন্ন অংশের নাম লিখতে হবে এবং তা শিক্ষকমহাশয়কে দেখিয়ে সই করিয়ে নিতে হবে। পাতার প্রস্থচ্ছেদ কাটতে হলে তা কিভাবে আলু বা গাজরের টুকরোর মধ্যে রেখে কাটতে হয় তা দ্বিতীয় অধ্যায়ে

বর্ণনা করা হয়েছে। যদি শিকড়ের অংশ খুব সরু ও নরম হয় তাহলেও তা আলু অথবা গাজরের টুকরোর মধ্যে রেখে কাটা যেতে পারে।

আরশোলার বহিরাকৃতিঃ কয়েকটি আরশোলা সংগ্রহ করে একটি কাঁচের জারের ভিতরে রাখতে হবে। পরে কিছু তুলোতে

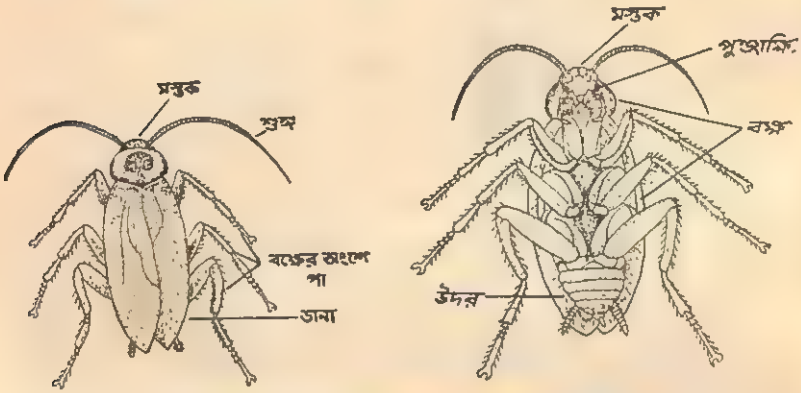

উপরের দিক ও নীচের দিক থেকে আরশোলার বহিরাকৃতি

ক্লোরোফর্ম মিশিয়ে জারের মধ্যে রেখে জারের মুখটি চাপা দিয়ে রাখতে হবে। কিছুক্ষণ পরে আরশোলাগুলি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লে অর্থাৎ তাদের নড়াচড়া সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেলে জার থেকে তাদের বার করে নিয়ে একটি ট্রের ওপর রেখে চিমটা ও নীডলের সাহায্যে তাদের বিভিন্ন অংশ দেখতে হবে। তারপর ব্যবহারিক খাতায় উপর দিক থেকে ও নীচের দিক থেকে আরশোলার বহিরাকৃতির দুইটি ছবি আঁকতে হবে ও বিভিন্ন অংশের নাম লেবেল করতে হবে ঐ ছবিতে।

কুনো ব্যাঙের বহিরাকৃতিঃ কুনো ব্যাঙের বহিরাকৃতি দেখতে হলে পূর্বোক্ত পদ্ধতিতে ব্যাঙটিকে ক্লোরোফর্মের সাহায্যে অজ্ঞান বা নিহত করে একটি ট্রের ওপর রেখে চিমটা ও নীডলের সাহায্যে তার বিভিন্ন অংশ পর্যবেক্ষণ করতে হবে। তারপর ব্যাঙের বহিরাকৃতির একটি ছবি আঁকতে হবে এবং দেহের বিভিন্ন অংশের নাম ঐ ছবিতে দেখাতে হবে।

কুনো ব্যাঙ

কুনো ব্যাঙের অন্তর্গঠন ঃ কুনো ব্যাঙের অন্তর্গঠন পর্যবেক্ষণ করতে হলে পূর্ববর্ণিত পদ্ধতিতে ব্যাঙটিকে ক্লোরোফর্মের সাহায্যে অজ্ঞান অথবা নিহত করে একটি মোম-জমানো ডিসেকটিং ট্রের ওপর চিত করে শায়িত কর। তারপর সামনের দুটি পা ও পেছনের দুটি পা আলপিনের সাহায্যে টান টান করে ট্রের মোমের সঙ্গে আটকে দাও। এরপর জল দিয়ে ট্রেটি পূর্ণ কর।

এখন বাঁ হাতে চিমটার সাহায্যে চামড়াটি তুলে ডান হাতে কাঁচি দিয়ে ব্যাঙের অঙ্কীয় মধ্যরেখা বরাবর চামড়াটিতে ছোট একটি ছিদ্র কর। চামড়ার এই ছিদ্র থেকে অঙ্কীয় মধ্যরেখা বরাবর চামড়াটি লম্বালম্বিভাবে কেটে ফেল। এইভাবে সামনের ও পেছনের পায়ের চামড়াও মাঝ বরাবর কেটে ফেল। এইবার ছুরির সাহায্যে চামড়ার কাটা অংশগুলি পেশীস্তর থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে দেহের দু'পাশে আলপিনের সাহায্যে ট্রের সঙ্গে টান টান করে আটকে দাও। এখন বড় কাঁচির সাহায্যে যেভাবে চামড়া-কাটা হয়েছে সেইভাবে পেশীস্তরটি কেটে ফেল। পেশীস্তর কাটবার সময় কাঁচির ভোঁতা দিকটি ভেতরে

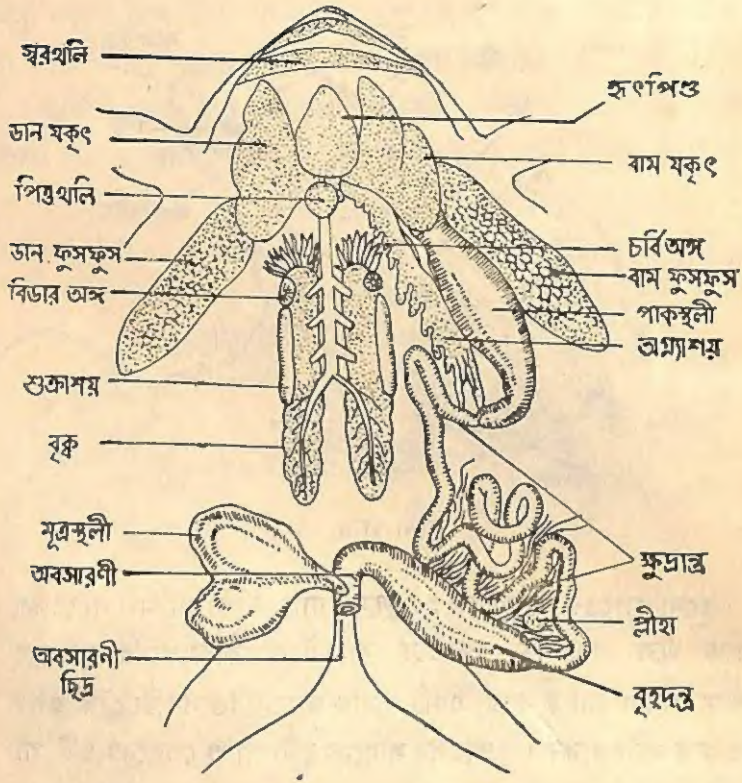

কুনো ব্যাঙের অন্তর্গঠন

প্রবেশ করাতে হয়, তাহলে অসতর্কতাবশতঃ কাঁচি চালাবার জন্য ভেতরের অঙ্গগুলির ক্ষতি হবার সম্ভাবনা কম থাকে। লম্বালম্বিভাবে পেশীস্তরটি কাটবার ফলে পেকটোরাল গার্ডেলটিও দ্বিধাবিভক্ত হবে। এরপর পেশীস্তরটিও চিমটা ও কাঁচির সাহায্যে কেটে চামড়ার মত টান টান করে ট্রের সঙ্গে আটকে দাও। এখন দেহগহ্বরটি উন্মুক্ত হওয়ায় ভেতরের অংশগুলি দেখা যাবে। ট্রের নোংরা জল বারবার ফেলে দিয়ে পরিষ্কার জলে ব্যাঙের বিভিন্ন অংশ পর্যবেক্ষণ কর। ব্যবহারিক খাতায় তারিখসমেত ব্যবচ্ছেদিত ব্যাঙটির একটি ছবি আঁক এবং বিভিন্ন অংশের নাম লেখ। শিক্ষকমহাশয়কে দেখিয়ে সই করিয়ে নাও।

INSTITUTE OF EDUCATION FOR WOMEN.
Dept. of Extension
Services
CALCUTTA-27

Das : Life Science for Class VIII, Bengali.

Rs. 3·23